গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৮ বর্ষ ১ সংখ্যা | ১ - ৭ আগস্ট ২০২৫ | Web: https://ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

বাংলাভাষী পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর নির্যাতনের তীব্র নিন্দা এস ইউ সি আই (সি)-র

দিল্লি, মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা, ওড়িশা সহ বিজেপি পরিচালিত রাজ্যের সরকারগুলি যে ভাবে বাংলাভাষী পরিযায়ী শ্রমিকদের বাংলাদেশি বলে দাগিয়ে দিয়ে প্রশাসনিক উৎপীড়ন চালিয়ে বসতিগুলি থেকে তাঁদের উৎখাত করছে, এসইউসিআই(সি) -র সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ তার তীব্র নিন্দা করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, দিল্লির জয় হিন্দ কলোনিতে বিদ্যুৎ ও পানীয় জল সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে যাতে অসহায় পরিযায়ী শ্রমিকরা এ দেশের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও সেখান থেকে সরে যেতে বাধ্য হন এবং তাঁদের সামান্য রুজি-রোজগারটুকুও তাঁরা হারান। এটা স্পষ্ট যে, বাংলাভাষী এইসব পরিযায়ী শ্রমিকদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মের মানুষ থাকলেও উগ্র হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক শাসকদের নির্যাতনের লক্ষ্য মূলত মুসলমান ধর্মাবলম্বীরাই। প্রতিক্রিয়াশীল শাসক-শক্তি সাম্প্রদায়িকতা প্রসারের উদ্দেশ্যে সংখ্যালঘুবিদ্বেষ ছড়িয়ে ভোটব্যাঙ্ক ভরানোর উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে চাইছে এবং দেশের বৈধ নাগরিক ভারতীয় মুসলমানদের হয়রান ও নির্যাতন করে এবং এমনকি 'পুশ ব্যাক' করে তাদের বাংলাদেশে

তিনের পাতায় দেখুন

কেন যেতে হবে ৫ আগস্টের সমাবেশে

পুরুলিয়া জেলার এক প্রান্তে দামোদর নদ ঘেঁষা গ্রাম। বৃষ্টিভেজা এক বিকেলে পঞ্চাশ-ষাটজন মানুষ জড়ো হয়েছেন গাছের ছায়াঘেরা এক প্রাঙ্গণে। আছেন কোল ওয়াশারি, ডিভিসির ঠিকাকর্মী, আছেন কৃষকরা। আলোচনা চলছে, সামনে আসছে ৫ আগস্ট, যেতে হবে কলকাতার সমাবেশে।

কলকাতার ট্যাংরা অঞ্চলে রাবার কারখানার এক ঘরে দেখা গেল এমনই এক সভা। যেমন দেখা গিয়েছিল গত সপ্তাহে উচ্চবিত্তের মনোরম বাড়ির পাশেই ছোট্ট পার্কে বিধাননগরের পরিচারিকা কর্মীরা সামান্য অবকাশের মাঝে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই সেরে নিচ্ছেন আলোচনা। গভীর মনোযোগে তাঁরা বুঝতে চাইছেন খেটে খাওয়া মানুষের জীবনে ৫ আগস্ট দিনটির তাৎপর্য। গত এক মাস ধরে ঠিক এমন দৃশ্যেরই দেখা মিলছে রাজ্যের প্রতিটি জেলায় নানা এলাকায়, কলে-কারখানায়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংলগ্ন কোনও ঘরে, পার্কে এমনকি বাসস্ট্যান্ডেও।

● *পুরুলিয়া জেলার সাঁওতালডি, কামারগোড়ায় ৫ আগস্টের তাৎপর্য নিয়ে সভা*

দেহের কষ্ট, দিনের রোজগার, চাষের কাজ, পরিবারের নানা অসুবিধা উপেক্ষা করেও এই সমাবেশে যেতেই হবে। কেন? রাজনৈতিক সমাবেশ তো অনেক হয়, তাতে দলে দলে মানুষ যোগও দেন। কিন্তু

পাঁচের পাতায় দেখুন

বিজেপির ভেজাল অনুপ্রবেশ তত্ত্ব ও তৃণমূলের ভোট-রাজনীতি

ক্লাসে প্রথম হওয়া ছাত্রটির যেমন খ্যাতি থাকে, তেমনই সবচেয়ে বদমায়েশ ছাত্রটিরও অনেক সময় খ্যাতি জুটে যায়। তবে তা কুখ্যাতি। ঠিক তেমনই কেন্দ্রের বিজেপি শাসনের অবস্থা। এক একটা (কু)কীর্তির জ্বালায় দেশের মানুষের বিজেপি শাসকদের ভোলার কোনও উপায় নেই। তা সে রাতারাতি লক ডাউন ঘোষণা হোক, নোট বাতিল হোক, কিংবা জিএসটি চালুই হোক। শাসক বিজেপি নেতাদের একটার পর একটা তুঘলকি ফরমানে দেশের মানুষকে তুর্কি নাচন নাচিয়ে ছাড়ছে। তার সর্বশেষ ফরমানটি নেমে এসেছে রাজ্যের বাংলাভাষী মানুষের উপর। বিশেষত, যাঁরা অন্য রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে কাজ করতে যান।

বিজেপির প্রচার

'বাংলাভাষী মানেই বাংলাদেশি' এমন একটা তত্ত্ব প্রচার করে পরিযায়ী শ্রমিকদের নির্বিচারে গ্রেফতার করছে মূলত বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলির প্রশাসন। আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, রেশন কার্ডের মতো সরকারি প্রমাণপত্র দেখিয়েও রেহাই পাচ্ছেন না তাঁরা। সঙ্গে রয়েছে গালাগালি, হেনস্থা ও মারধর। এই সব কাগজপত্র, মোবাইল, টাকাপয়সা কেড়ে নিয়ে কাউকে ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে তো কাউকে পুশব্যাক করা হচ্ছে বাংলাদেশ সীমান্তের ওপারে। এমনও ঘটেছে যে, বুলডোজার দিয়ে একজনকে কাঁটাতারের ওপারে ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে।

এমন একটি বেআইনি, অসাংবিধানিক কাজ বিজেপি করছে কেন? পশ্চিমবঙ্গ ভারতের একটি অঙ্গরাজ্য। এখানকার যে কোনও বাংলাভাষী নাগরিক দেশের যে কোনও প্রান্তে কাজকর্ম, ব্যবসাপত্র, পড়াশোনা, বসবাসের জন্য যাওয়ার এবং থাকার পূর্ণ অধিকারী। ঠিক যেমন অন্য রাজ্যের বহু মানুষ নানা প্রয়োজনে এ রাজ্যে এসে বসবাস করেন। বিজেপি নেতাদের কি বিষয়টি জানা নেই? না হলে তাঁরা এমন কাজ করছে কেন?

বিজেপি নেতাদের বক্তব্য, বাংলাদেশ থেকে বিপুল সংখ্যায় মানুষ এ দেশে ঢুকে পড়েছে এবং তারা এ রাজ্যের সরকারের সহযোগিতায় আধার, রেশনের মতো নানা ধরনের কার্ড করিয়ে নিয়েছে। আচ্ছা, রাজ্যে রাজ্যে বাংলাদেশি অভিযোগে যাঁদের আটকানো হচ্ছে, তাঁরা সত্যিই বাংলাদেশি কি না, তা প্রমাণের দায়িত্ব কার? অভিযোগকারীর তো? তা হলে কেন অভিযুক্তদেরই তা প্রমাণ করতে বলা হচ্ছে? বিজেপি নেতাদের স্বেচ্ছাচারিতার মাশুল কেন দেশের একজন স্বাধীন নাগরিককে দিতে হবে? এ কি কোনও নিয়ম কানুনের তোয়াক্কা না করে আইন হাতে তুলে নেওয়া নয়? আর যদি সত্যিই জাল পরিচয়পত্র এমন ব্যাপক হারে তৈরি করা হচ্ছে বলে বিজেপি নেতাদের জানা থাকে তবে কেন্দ্রের এজেন্সিগুলি যারা হয় কথায় নয় কথায় বিরোধীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে— সেই

দুয়ের পাতায় দেখুন

৫ আগস্ট

সর্বহারার মহান নেতা

কমরেড শিবদাস ঘোষ

৫০তম স্মরণ দিবসে

সমাবেশ

প্রধান বক্তা ঃ **কমরেড প্রভাস ঘোষ**

সভাপতি ঃ **কমরেড অশোক সামন্ত**

রানি রাসমণি অ্যাভিনিউ

বেলা ২টা

বিজেপির ভেজাল অনুপ্রবেশ তত্ত্ব

একের পাতার পর

এনআইএ, সিবিআই হাত গুটিয়ে রয়েছে কেন?

অন্য দিকে, সহনাগরিকদের একটি অংশ বিজেপি শাসকদের দ্বারা এ ভাবে নিপীড়নের শিকার হচ্ছেন তা দেখে দেশের বাকি বড় একটি অংশ হয় চুপ করে আছেন, নয়তো বিজেপির মিথ্যা প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে বলছেন, ঠিকই তো, এ দেশটা যদি বাংলাদেশি মানুষে ভরে যায় তবে তো আমরা এক সময় সংখ্যালঘু হয়ে যাব। তাই বাংলাদেশিদের তো চিহ্নিত করে দেশ থেকে বের করে দেওয়াই দরকার। যাঁরা এ কথা বলছেন, তাঁরা বিচার করে দেখছেন না যে, বিজেপি নেতাদের এই প্রচারের সঙ্গে বাস্তবের আদৌ কোনও মিল আছে কি নেই। বিজেপি নেতারা কোথাও তথ্য-প্রমাণ দিয়ে এ কথা বলছেন না।

অনুপ্রবেশ ছাড়া বিজেপির কোনও ইস্যু নেই

বাস্তবে অনুপ্রবেশ তত্ত্বটি বিজেপি-আরএসএসের একটি পুরানো রাজনৈতিক ইস্যু। এই মুহূর্তে বিজেপির হাতে অন্য কোনও ইস্যু নেই। দেশে তৃতীয় বারের জন্য বিজেপি শাসন প্রতিষ্ঠিত হলেও বাস্তবে এই দীর্ঘ শাসনে এমন কোনও সাফল্য নেই যা তারা দেশের মানুষের সামনে তুলে ধরতে পারে এবং তা দিয়ে মানুষের সমর্থন আদায় করতে পারে। মূল্যবৃদ্ধি থেকে কর্মসংস্থান, শিক্ষা থেকে স্বাস্থ্য, নারীর নিরাপত্তা থেকে দলিতদের জন্য সমান অধিকার— প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের সাফল্য শূন্য। নিত্যপ্রয়োজনীয় প্রতিটি জিনিসের দাম লাফিয়ে বাড়ছে। অথচ মানুষের হাতে কাজ নেই। রোজগার নেই। অতি প্রয়োজনীয় জিনিসটুকুও কিনতে পারছে না। দেশ বেকারে ছেয়ে গেছে। শুধু শিক্ষার সুযোগ না পাওয়া মানুষেরাই নয়, শিক্ষিত মানুষও কাজের জন্য ছুটছে বিদেশে। একটু রোজগারের আশায় এমনকি বেআইনি পথেও উন্নত দেশগুলিতে ঢুকে পড়ছে। মৃত্যুর পূর্ণ আশঙ্কা জেনেও ভারতীয় বহু যুবক ইজরায়েলী সেনাবাহিনীতে গিয়ে ভাড়া খাটছে। সম্প্রতি আমেরিকা থেকে শৃঙ্খলিত অবস্থায় বেআইনি ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীদের মার্কিন সামরিক বিমানে ফেরত পাঠানোর ঘটনা দেশে এখন আর কারও অজানা নয়। মহিলাদের খুন, ধর্ষণ বিজেপি শাসনে সাধারণ ঘটনায় পরিণত হয়েছে। বাল্য বিবাহ, প্রসূতি মৃত্যু অতীতের সমস্ত রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। ধনকুবেরদের মুনাফা অব্যাহত রাখতে অর্থনীতির পরিপূর্ণ সামরিকীকরণের পথে হাঁটছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। আর এই চরম জনস্বার্থবিরোধী কাজে জনসাধারণের সম্মতি আদায় করতে সরকারের ধামাধরা প্রচারমাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে তৈরি করা হচ্ছে ব্যাপক যুদ্ধোন্মাদনা।

এই অবস্থায় দেশজুড়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিক্ষোভ বাড়ছে। প্রায়ই এখানে ওখানে নানা অভিযোগকে কেন্দ্র করে তা ফেটে পড়ছে। এই অবস্থায় ক্ষুব্ধ মানুষের দৃষ্টিকে ঘুরিয়ে দিয়ে রাজ্যে রাজ্যে নির্বাচনগুলিতে ক্ষমতা ধরে রাখতে বা দখল করতে মিথ্যা আর প্রতারণা ছাড়া বিজেপির সামনে আর কোনও রাস্তা খোলা নেই। এ ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ একটি অত্যন্ত শক্তিশালী হাতিয়ার। যদিও এটি বিজেপি-আরএসএসের কোনও নতুন হাতিয়ার নয়। ১৯৩৮-৪০ সাল থেকেই বিজেপির পূর্বসূরী হিন্দু মহাসভা এবং আরএসএস মুসলিম সংখ্যাবৃদ্ধির তত্ত্ব প্রচার করে সাধারণ হিন্দুদের মধ্যে সংখ্যালঘু হয়ে যাওয়ার ভীতি ছড়িয়ে আসছে। এই প্রচারের পিছনে কোনও যুক্তি বা তথ্যই তারা আজ পর্যন্ত দেয়নি। অথচ তথ্য নেই তা কিন্তু নয়। তা হলে তারা তা ব্যবহার করে না কেন? করে না কারণ সেই তথ্যগুলি তাদের এই প্রচারের বিরুদ্ধেই যাবে। তাদের যুক্তির অসারত্বকেই প্রমাণ করবে। দেখা যাক কী বলছে এই তথ্য।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি কি ব্যাপক হারে ঘটছে

প্রথমে দেখা যাক, পশ্চিমবাংলায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি সত্যিই ব্যাপক হারে ঘটছে কি না এবং মুসলিমদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হিন্দুদের সংখ্যা বৃদ্ধির গড় হারের থেকে অনেক বেশি কি না। দেখা যাচ্ছে, ১৯৯১ থেকে ২০০১ সালের মধ্যে রাজ্যে হিন্দু জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার ছিল ১৪.২ শতাংশ, যা ২০০১ থেকে ২০১১ সালে কমে হয়েছে ১০.৮ শতাংশ। একই সময়ে মুসলমানদের জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার ২৫.৯ শতাংশ থেকে কমে হয় ২১.৮ শতাংশ। অর্থাৎ, সম্প্রদায়-নির্বিশেষে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার হ্রাস পেয়েছে। মুসলিম জনসংখ্যা কমার হার বেশি। এ বার জন্মহারের বিষয়টি একটু খেয়াল করা যাক। ২০০১ সালে পশ্চিমবঙ্গে সার্বিক জন্মহার (টোটাল ফার্টিলিটি রেট বা টিএফআর, অর্থাৎ এক জন মহিলা তাঁর জীবনে গড়ে মোট যতগুলি সন্তানের জন্ম দেন) ছিল ২.৬, যা ২০১১ সালে কমে হয় ১.৭ এবং ২০১৫-১৬ সালে হয় ১.৮। হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে জন্মহার এই বছরগুলিতে ছিল যথাক্রমে ২.২, ১.৭ এবং ১.৬। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ২০০১ সালে জন্মহার ছিল ৪.৬, যা মাত্র দশ বছরে কমে হয় ২.২ এবং ২০১৫-১৬ সালে হয় ২.১। অর্থাৎ, প্রতি মুসলমান মায়ের সন্তানসংখ্যা বিগত ১৫ বছরে কমেছে দুইয়ের বেশি। পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানদের মধ্যে জন্মহারের কমার পরিমাণ দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ। যার ফলে মুসলমানদের জন্মহার প্রায় হিন্দুদের জন্মহারের কাছাকাছি চলে এসেছে। শিক্ষার প্রসার, সচেতনতা, সন্তানদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার আকাঙ্ক্ষা, এই সবই জন্মহার কমাতে সহায়ক ভূমিকা নিয়েছে।

সুতরাং, মুসলমানদের সংখ্যা ভারতে কখনও হিন্দুদের সংখ্যাকে ছাপিয়ে যাওয়ার সত্যিই কোনও আশঙ্কা নেই। বিজেপি-আরএসএস মানুষকে অযথা ভয় পাইয়ে দিয়ে হিন্দু ভোটব্যাঙ্ক তৈরির লক্ষ্যেই এই মিথ্যা প্রচার চালায়।

অনুপ্রবেশ ঃ তথ্য কী বলছে

এ বার বিজেপি-আরএসএসের লাখে লাখে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ তত্ত্বের সত্যতা বিচার করা যাক। স্বাধীনতার পর বিরাট সংখ্যক ও-পার বাংলার মানুষ এ দেশে এসেছেন। সরকার তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছে। এবং তাঁদের বেশির ভাগই হিন্দু। এ নিয়ে বোধহয় বিজেপিরও খুব মাথাব্যথা নেই। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের সময়ে কয়েক লক্ষ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশের কথাও কারও অজানা নয়। যদিও তাদের প্রায় বেশির ভাগটাই স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে গেছেন বলে সরকারও মনে করে। অনুপ্রবেশের সাম্প্রতিক ছবিটা একবার দেখা যাক।

২০১১ সালের জনগণনার সময় পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী প্রায় ২২ লক্ষ মানুষ জানান যে তাঁদের জন্ম বাংলাদেশে। এঁদের মধ্যে ৫০ শতাংশ (১১ লক্ষ) মানুষ নদিয়া এবং উত্তর ২৪ পরগনার বাসিন্দা। তাঁরা মূলত মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষ। মুসলমান প্রধান জেলাগুলি যেমন মালদহ, মুর্শিদাবাদে বাংলাদেশকে নিজের জন্মস্থান বলা মানুষের সংখ্যা নগণ্য। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের তথ্য এবং ২০১১ সালের জনগণনার রিপোর্ট দেখাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে কয়েক কোটি অনুপ্রবেশকারী আছে, এ কথাটি বিজেপি-আরএসএস বাহিনীর ডাহা মিথ্যা প্রচার ছাড়া কিছু নয়।

তৃণমূল কংগ্রেসের ভোট-রাজনীতি

বিজেপির অনুপ্রবেশ সংক্রান্ত সাজানো প্রচারের ফলে রাজ্যের বাংলাভাষী মানুষের দুর্গতি প্রতিরোধে তৃণমূল সরকারের ভূমিকাটি ঠিক কী? বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে বাংলাভাষী মানুষদের উপর বাংলাদেশী তকমা লাগিয়ে হেনস্থার ঘটনা অনেক দিন ধরেই ঘটছে। এ রাজ্য সহ কয়েকটি রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বিজেপি দেশজুড়ে অনুপ্রবেশ ইস্যুটির ব্যাপক প্রচার করেছে। সে ক্ষেত্রে বলির পাঁঠা করা হচ্ছে দরিদ্র বাংলাভাষী পরিযায়ী শ্রমিকদের। কারণ বিজেপি নানা রাজ্যে শয়ে শয়ে বাংলাভাষীদের গ্রেফতার করে দেখাতে চায় যে কী ভাবে বাংলাদেশিরা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। এটা দেখাতে পারলে তার অনুপ্রবেশ তত্ত্বও সত্যি প্রমাণ হয়। কিন্তু রাজ্যের তৃণমূল সরকার কেন শুরু থেকেই এই ঘটনার প্রতিবাদ করেনি। কেন অন্য রাজ্যের সরকারগুলি এবং কেন্দ্রের সরকারের কাছে এর এমন বেআইনি কাজের জবাবদিহি চায়নি? কেন রাজ্যের মন্ত্রী এবং প্রশাসনের কর্তারা আইনি পথে তা আটকানোর চেষ্টা করেননি? বিজেপির এই হীন ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে কেন তাঁরা রাজ্যের মানুষকে সচেতন করেননি? কেন রাজ্য সরকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই কাজগুলি করেনি তা স্পষ্ট হয়ে যায় গত ২১ জুলাই কলকাতায় তৃণমূলের সমাবেশে দলনেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীর বক্তৃতা থেকেই। তিনি সে দিন বললেন, "আজ থেকে শুরু হল আন্দোলন। এখন থেকে প্রতি শনি ও রবিবার বাংলা ভাষার উপরে আক্রমণের প্রতিবাদে মিটিং-মিছিল করুন। এই আন্দোলন চলবে আগামী ভোটের ফল বেরোনো পর্যন্ত।" কেন বাংলাভাষীদের উপর আক্রমণের প্রতিবাদে তাঁদের আন্দোলন শুধুমাত্র ভোটের ফল বেরোনো পর্যন্তই চলবে? কেন সমস্যাটি সমাধান না হওয়া পর্যন্ত তা চলবে না? অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করে দিলেন এটা ভোটের ইস্যু।

বাস্তবে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য থেকেই স্পষ্ট, কেন তাঁরা তাঁদের যা করার ছিল এতদিন তা করেননি। তাঁরা আসলে অপেক্ষা করছিলেন— সমস্যাটি আরও গুরুতর আকার নিক। সংখ্যালঘু মানুষের বিপন্নতা আর একটু বাড়ুক। অন্য দিকে ভোটও আরও কাছে আসুক। তখনই তাঁরা প্রতিবাদে ঝাঁপাবেন। অর্থাৎ বাংলাভাষী মানুষের উপর বিজেপির এই অন্যায় হামলা মুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁর দলের কাছে আদৌ কোনও গুরুতর সমস্যা নয়, শুধু ভোটের একটি ইস্যু মাত্র। অর্থাৎ তাঁদের সমস্ত প্রতিবাদের লক্ষ্যবিন্দু রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন। 'বাংলা ভাষা বিপন্ন', 'বাঙালি বিপন্ন' আওয়াজ তুলে নিজেদের বাংলার ত্রাতা প্রমাণ করে 'বাঙালি এক হও' স্লোগান তুলে নির্বাচনে বাজিমাত করাই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। অর্থাৎ অনুপ্রবেশ তত্ত্ব আওড়ে বিজেপি যেমন ভোট-রাজনীতি করছে, তৃণমূল কংগ্রেসও তেমনই 'বাংলা বাঁচাও' স্লোগান তুলে একই ভোট-রাজনীতির চর্চাতেই নেমেছে। না হলে, বাংলাকে বাঁচানো, বাংলা ভাষাকে বাঁচানো সত্যিই তাদের উদ্দেশ্য নয়। বাংলা মাধ্যম শিক্ষা ব্যবস্থাটিকে শেষ করে দিয়ে তারা একই সঙ্গে বাংলা ভাষাকেও শেষ করছে। কেন্দ্রীয় শিক্ষানীতিকে এ রাজ্যে কার্যকর করে ভাষা-শিক্ষা-সংস্কৃতিকে বিপন্ন করে তুলছে। অন্য দিকে চুরি-দুর্নীতি, খুন-ধর্ষণ, সাম্প্রদায়িক রাজনীতির চর্চার মধ্যে দিয়ে বাংলার উন্নত সংস্কৃতিকেও তারা শেষ করছে। বাংলা বাঁচানো আর যারই হোক তৃণমূল কংগ্রেসের কাজ নয়।

বিজেপি-তৃণমূলের ভোট-রাজনীতির বাইরে গিয়ে প্রতিরোধ গড়তে হবে

এই অবস্থায় রাজ্যের মানুষকে বিজেপি এবং তৃণমূলের সংকীর্ণ দলীয় ভোট রাজনীতির বাইরে গিয়ে নিজেদের সত্যিকারের সমস্যাগুলি সমাধানের সঠিক উপায় নিয়ে ভাবতে হবে এবং বিজেপির বাংলাদেশি তত্ত্বের উদ্দেশ্য এবং তার সর্বনাশা দিকটি সঠিক ভাবে উপলব্ধি করতে হবে। কেউ যদি মনে করেন যে এটা শুধু বাংলাভাষী মুসলিমদের সমস্যা তবে তা ভুল হবে। এখন হয়তো বিজেপির এই আক্রমণ প্রধানত মুসলিমদের উপরই ঘটছে। যদি এখনই ধর্ম নির্বিশেষে এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা না যায়, যদি বিজেপি এই ষড়যন্ত্রে সফল হয় তবে আগামী দিনে তার আক্রমণের হাত থেকে কেউই রেহাই পাবে না। কারণ শাসক বিজেপির উদ্দেশ্য মানুষকে ধর্মে হোক, বর্ণে হোক আর প্রাদেশিকতাতেই হোক বিভক্ত করো এবং তার শোষণমুক্তি সংগ্রামকে দুর্বল করো। আসামে এনআরসি-র সময়ে অনেকের ধারণা ছিল তা শুধু মুসলিমদের স্বার্থের বিরুদ্ধেই যাবে। যখন এনআরসির তালিকা প্রকাশ পেল, দেখা গেল, ১৯ লক্ষ মানুষ যাদের রাষ্ট্রহীন ঘোষণা করা হয়েছে তাদের বড় অংশই হিন্দু। পুরুলিয়ায় হিন্দু পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপরেও হুমকি এসেছে, কোচবিহারে বসে আসাম থেকে এনআরসি নোটিশ যাঁরা পাচ্ছেন তাঁরাও হিন্দু। সদ্য উত্তরপ্রদেশে কাঁওয়ার যাত্রার সময়ে যখন সরকার রাস্তার দু'দিকে মুসলিম দোকানদারদের নাম এবং ধর্মপরিচয় প্রকাশ্যে টাঙিয়ে রাখার নিদান দিয়েছিল তখন হিন্দু দোকানদাররা প্রতিবাদ করেননি। বাস্তবে দেখা গেল, কাঁওয়ার যাত্রীরা শুধু মুসলিমদের দোকানেই হামলা চালায়নি, হিন্দুদের দোকানেও জিনিস নিয়ে দাম না দেওয়া, তুচ্ছ অভিযোগে ভাঙচুর চালানো নির্বিচারে ঘটিয়েছে। এখন দোকানদাররা হিন্দু-মুসলমান ঐক্যবদ্ধ ভাবে প্রশাসনের কাছে জানাতে বাধ্য হয়েছে যে, আগামী বছর থেকে তারা এই কাঁওয়ার যাত্রার সময়ে রাস্তা দুদিকের সমস্ত দোকান বন্ধ রাখবেন।

তাই যা করার এখনই করতে হবে। অনুপ্রবেশের ফাঁপানো প্রচার তুলে ভোট রাজনীতির বিপদ অনুধাবন করা দরকার। এই সঙ্গে বোঝা দরকার বাঙালি অস্মিতার নামে প্রাদেশিকতাবাদের বিপদ। কেন্দ্র ও রাজ্যে আসীন দুই সরকার এ ভাবে আগুন নিয়ে খেলছে। যাদের কাজ হওয়া উচিত ঐক্য সংহতি রক্ষা তারাই জল দিচ্ছে বিভেদের বিষবৃক্ষে। জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে শোষিত মানুষের সমানে এ এক গুরুতর বিপদ।

তথ্য সূত্র ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২০

জ্ঞান আর পাণ্ডিত্যাভিমান এক জিনিস নয়

শিবদাস ঘোষ

"জ্ঞান ক্রিয়া-বিচ্যুত নয়। যখন জ্ঞান সত্যকে প্রতিফলিত করে তখন সে জ্ঞান ক্রিয়াশীল হয়, ক্রিয়াধর্মী হয়। অর্থাৎ তখনই তা হল যথার্থ জ্ঞান। জ্ঞান যেখানে যথার্থ সত্যকে প্রতিফলিত করে না, তখন সে অহমের জন্ম দেয়, পাণ্ডিত্যাভিমানের জন্ম দেয়। সে তখন অকাজ করে, সমাজের বুকে সে বোঝাস্বরূপ হয়ে পড়ে। সে নানা বিপদ এবং বিপত্তির সৃষ্টি করে। রাজনীতিতে এবং ফিলজফিতে যার জন্য স্কলাস্টিসিজম (পাণ্ডিত্যাভিমান), সিউডো (মেকি) ইন্টেলেকচুয়ালিজম (পণ্ডিতি), অ্যাকাডেমিক ট্রেন্ড (পুঁথিগত বিদ্যা)— এইগুলোকে খুব নিন্দা করা হয়। কারণ বিপ্লবী রাজনীতি হচ্ছে জীবনবেদকে রূপায়িত করার বাস্তব প্রক্রিয়া। এখানে ভাববিলাসিতার স্থান নেই, এখানে অকাজের স্থান নেই। স্কলাস্টিসিজম এই অকাজ করে। সিউডো ইন্টেলেকচুয়ালিজম, অ্যাকাডেমিক আউটলুক (দৃষ্টিভঙ্গি)— এই অকাজগুলি নানা দিক থেকে ক্ষতিসাধন করে বলেই সমস্ত বিপ্লবীদের বারবার বলতে হয়েছে— জ্ঞান আর পাণ্ডিত্যাভিমান এক জিনিস নয়। ইন্টেলেকচুয়ালিজম আর জ্ঞান এক জিনিস নয়। স্কলাস্টিসিজম আর বিপ্লব সম্পর্কে সত্য ধারণা এবং জ্ঞানের আলোকে তা প্রতিভাত হওয়া এক জিনিস নয়—তা সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। শ্রেণিগত দিক থেকে এবং তার কার্যকারিতার দিক থেকেও তা বিপরীতধর্মী। যেমন লেনিন ভীষণভাবে এমপিরিসিস্টদের (অভিজ্ঞতাবাদীদের) বিরুদ্ধে ছিলেন।

সাধারণ অর্থে যাকে আমরা জ্ঞান বলি— খবর রাখা, বলতে পারা, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সমস্ত কিছুকে দেখা, এমপিরিসিস্টরা মূলত তাই করে। কত খুঁটিনাটি সূক্ষ্ম জিনিস তারা অনুসন্ধান করে করে নানা ঘটনা উপস্থাপনা করে। কী বিরাট পরিশ্রমের কাজ এই এমপিরিসিস্টরা করে। কিন্তু তবুও লেনিনকে এই এমপিরিসিস্টদের বিটারলি (কঠোরভাবে) সমালোচনা করতে হয়েছিল। তার কারণ দ্যাট স্টুড ইন দ্য ওয়ে অ্যাজ এ স্টাম্বলিং ব্লক টু রেভোলিউশনারি আইডিয়া (তা বিপ্লবী আদর্শের বিরুদ্ধে বিরাট প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল)। সত্য ধারণা এবং তার ওপর ভিত্তি করে ক্রিয়াকে রিলিজ করা (কাজের জোয়ার সৃষ্টি করা), ক্রিয়াধর্মী জ্ঞান যা সমাজ পরিবর্তন, বস্তুর পরিবর্তন, কার্যক্ষেত্রে সমস্ত গতিকে ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করে, এমপিরিসিস্টরা তার পথে বাধা সৃষ্টি করে। ফলে উপকার করার চেয়ে তারা অপকারই করে। জ্ঞান যখন বাধার সৃষ্টি করে তখন তাকে কুজ্ঞান বলে। এমনিতেও তো বাংলায় সুজ্ঞান ও কুজ্ঞান বলে দুটো কথা আছে। কুজ্ঞান অর্থে যদি জ্ঞান বল তো তাকে কুজ্ঞান বলা উচিত। আপনি কী জানলেন, কী বলতে পারলেন, কী লিখতে পারলেন এবং সে সম্বন্ধে হেগেল কী বলেছেন, এ সম্বন্ধে মার্ক্স কী বলেছেন, এ সম্বন্ধে অমুকে কী বলেছে, আর এই ফ্রিডম সংক্রান্ত বহু মনীষীর ভুরি ভুরি উদ্ধৃতি আপনার মুখস্থ থাকতে পারে, কিন্তু ফ্রিডম তত্ত্বের যথার্থ মানে ততক্ষণ আপনার বোঝাই হল না, নেসেসিটির যথার্থ উপলব্ধি ততক্ষণ আপনার হয়নি, যতক্ষণ না নেসেসিটি বলতে আপনি যেটা বুঝেছেন সেই

প্রক্রিয়ায় সক্রিয় সংগ্রামে নিয়োজিত হচ্ছেন। আর এই সংগ্রাম করার মধ্য দিয়েই ধীরে ধীরে ফ্রিডমের উপলব্ধি আপনার মধ্যে প্রস্ফুটিত এবং প্রোজ্জ্বল হতে থাকে। যতক্ষণ আপনি এই সংগ্রামের মধ্যে নেই, ততক্ষণ আপনার বোঝা ভাসাভাসা থাকে এবং বোঝার মধ্যে অনেক ত্রুটি থেকে যায়। তারপরও যদি আপনি বলেন যা যুক্তিসঙ্গত এবং যা উচিত বলে মনে করি তার জন্য আমি কাজ করতে পারি না, যা অন্যায়, দুষ্ট, আমার পক্ষে ক্ষতিকর বলে মনে করি তা আমি আঁকড়ে ধরেই থাকি, তা হলে আমি কি নিজেকে মনুষ্য পদবাচ্য র‍্যাশনাল বিইং (বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন জীব) ভাবতে পারি?

আপনারা কি এই কথাটার মানে বোঝেন যে, ইউ কানট ফাইট ফর ইওর ওন ফ্রিডম উইদাউট ফাইটিং ফর দ্য ফ্রিডম অফ আদারস (অন্যের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম না করলে নিজের স্বাধীনতার জন্য আপনি লড়তে পারেন না)। আগেও বহু ক্লাসে এ কথা আপনাদের বলেছি— এই ফ্রিডম কথাটা বুঝতে হবে কী ভাবে? বুঝতে হবে— তুমি যদি নিজে বিকাশলাভ করতে চাও, সমাজ বিকাশের জন্য তোমার যদি উদ্বেগ এবং আকাঙ্ক্ষা থাকে, সংস্কৃতিসম্পন্ন, রুচিসম্পন্ন, শালীনতা এবং মর্যাদাসম্পন্ন জীবনযাপন করতে যথার্থই যদি তুমি চাও এবং মর্যাদা সম্পর্কে তোমার যদি কোনও ভ্রান্ত ধারণা না থাকে, মর্যাদা মানে টাকাপয়সা, মর্যাদা মানে আইসিএস অফিসার হওয়া, মর্যাদা মানে হাইকোর্টের জজ হওয়া, মর্যাদা মানে মিনিস্টার হওয়া, চিফ মিনিস্টার হওয়া, মর্যাদা মানে অ্যামবাসাডার (রাষ্ট্রদূত) হওয়া এবং গাড়িবাড়ি থাকা, লোকে আমাকে স্যার স্যার বলবে, এই রকম তোমার যদি ভাবনা না থাকে, মর্যাদা কথাটার যথার্থ উপলব্ধি যদি তোমার থাকে তা হলে এ সমাজে তার একটাই মানে। সেটা হচ্ছে, দ্য ওনলি ওয়ে টু লিড ইওর লাইফ ইন অ্যান অনারেবল ওয়ে ইজ টু এনগেজ ইওরসেলভস কনস্ট্যান্টলি ইন দ্য স্ট্রাগল অফ দ্য মাসেস ফর জাস্টিস (মর্যাদাময় জীবন যাপনের একমাত্র রাস্তা হল জনগণের জন্য ন্যায়প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিজেদের অবিরত নিযুক্ত রাখা)। ইনজাস্টিসের (অন্যায়ের) বিরুদ্ধে সমাজের সর্বস্তরের জনসাধারণের সংগ্রাম সংগঠিত করা এবং তাকে নিয়ে লড়াই করা এবং এই লড়াই সংগঠিত করার কাজে এবং সংগ্রামে নিজেকে নিয়োজিত করার মধ্য দিয়েই কেবল তুমি মর্যাদা এবং ডিগনিটিসম্পন্ন জীবনযাপন করতে পার। বাকি সমস্ত রাস্তা হল সেল্ফ ডিসেপশন (আত্মপ্রতারণা), মর্যাদার নয়— অহম মাত্র। কারণ এ সমাজে ওয়াগন ব্রেকারের টাকায় সম্পত্তি করলেও মর্যাদা মেলে, ফুলের মালা মেলে। ডাকাতি-গুন্ডামির পয়সায় টাকা-কড়ি হলে তারও কদর হয়। তারপরে সে এমএলএ, এমপি হয়, আর তা হয় পয়সার জোরে। তারপরে সে মিনিস্টার হয়। তারপরে তিনি বাণী দিতে থাকেন। তা তিনি যদি এ সব ঠুনকো মর্যাদায় আত্মসন্তুষ্টি পান তা হলে ফ্রিডম নিয়ে অত মাথা ঘামাবার দরকার কী?"

'বিপ্লবী জীবনই সর্বাপেক্ষা মর্যাদাময়'
পুস্তক থেকে

আন্দোলনে গ্রামীণ চিকিৎসকরা

পুরুলিয়া ঃ গ্রামীণ চিকিৎসকদের নাম নথিভুক্ত করে প্রশিক্ষণ ও শংসাপত্র দেওয়া এবং স্বাস্থ্যকর্মী হিসাবে স্থায়ী নিয়োগ, ওষুধের লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি রোধ ও ভেজাল ওষুধের

কারবার বন্ধ সহ ৭ দফা দাবিতে পিএমপিএআই-এর নেতৃত্বে ১০ জুলাই মিছিল সহকারে জেলা সি এম ও এইচ দপ্তরে ডেপুটেশন দেওয়া হয় (ছবি)।

দেড় শতাধিক গ্রামীণ চিকিৎসক উপস্থিত ছিলেন।

পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ জেলার গড়বেতা-২ ব্লকে এক পিএমপিএআই সদস্যের চিকিৎসালয়ে ড্রাগ কন্ট্রোল অফিস থেকে হানা দিয়ে এক লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়। না দিলে গ্রেপ্তার করা হবে এবং চিকিৎসালয় বন্ধ রাখতে হবে বলে হুলিয়া জারি করা হয়। এর প্রতিবাদে ১০ জুলাই গড়বেতা-২ ব্লকের সদস্যরা বিডিও, বিএমওএইচ এবং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির কাছে ডেপুটেশন দেন। ২৪ জুলাই জেলা ড্রাগ কন্ট্রোলার এবং সিএমওএইচকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। আধিকারিকরা সংগঠনের দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করে সহমত প্রকাশ করেন এবং সেগুলি পূরণের আশ্বাস দেন।

পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর নির্যাতনের নিন্দা

একের পাতার পর

পাঠিয়ে দিতে চাইছে।

তিনি বলেন, এই ষড়যন্ত্রের বিরোধিতা করার নামে কয়েকটি বিরোধী রাজনৈতিক দল সংকীর্ণ আঞ্চলিকতাবাদী মানসিকতার প্রসার ঘটাতে চাইছে যা প্রতিরোধ করা প্রয়োজন।

নিপীড়িত পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর এমন অপরাধমূলক আচরণের প্রতিবাদে দেশের সমস্ত গণতন্ত্রপ্রিয় নাগরিককে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। তিনি বলেন, এই ভয়ানক পদক্ষেপ যদি সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করা না যায় তা হলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ইতিমধ্যেই যে বিভেদ রয়েছে, তা আরও বাড়বে যা দেশের সমাজ-পরিবেশ ও মানুষে মানুষে সম্পর্ককে বিষাক্ত করে তুলে শাসক পুঁজিপতি শ্রেণি ও তার সেবাদাসদের স্বার্থ পূরণ করবে।

বৃষ্টিতে ফুল ও সব্জি চাষের দফারফা, ক্ষতিপূরণের দাবি

প্রবল বৃষ্টিতে পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সব্জি ও ফুলচাষ ভীষণভাবে ক্ষতির মুখে। সারা বাংলা ফুলচাষি ও ফুলব্যবসায়ী সমিতি ও কৃষক সংগ্রাম পরিষদের সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক বলেন, টানা এক মাসেরও বেশি সময় ধরে বৃষ্টিতে মাটি ভিজে ও স্যাঁতসেতে থাকায় গাঁদা-দোপাটি সহ বিভিন্ন ফুল ও বাহারিপাতা বাগানের অর্ধেকেরও বেশি গাছ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। পাপড়িযুক্ত ফুলের ভেতরে বৃষ্টির জল ঢুকে কিছু পাপড়ি পচে গিয়ে ফুলের গুণমান নষ্ট হয়েছে। চাষিরা ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। সব মিলিয়ে আসন্ন পুজো মরশুমে ফুলের সংকট দেখা দেবে। সংগঠনের দাবি, অবিলম্বে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

আড়ষায় চুরির অপবাদে পিটিয়ে খুন প্রতিবাদীদের আটক করল পুলিশ

পুরুলিয়া জেলায় আড়ষা গ্রামের বিষ্ণু কুমারকে মোবাইল চুরির অপবাদে গ্রেপ্তার করেছিল আড়ষা থানার পুলিশ। যদিও পরিযায়ী শ্রমিক এই যুবক বারবারই বলেছেন, গ্রামেরই পরিচিত একজনের মোবাইল তিনি কুড়িয়ে পেয়েছেন এবং যার মোবাইল তাকে ফেরত দিতে চান। কিন্তু পুলিশ তাকে থানায় ধরে নিয়ে এসে বেধড়ক মারধর করে। সন্ধ্যায় তাঁর শারীরিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠলে তাঁকে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়। মানসিক ও শারীরিক ভাবে ভেঙে পড়েন তিনি। শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে ১৯ জুলাই তাঁকে হাসপাতাল নিয়ে যাওয়া হয়। ব্লক হাসপাতালের চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

এই ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন গ্রামবাসীরা। তাঁরা বলেন এটা প্রশাসনিক হত্যা। পোস্টমর্টেম রিপোর্টে তা আড়াল করার চেষ্টা হয়েছে। স্থানীয় মানুষ থানায় গিয়ে দাবি করেন, আবার পোস্টমর্টেম করতে হবে এবং ঘটনার বিচারবিভাগীয় তদন্ত করে দোষী পুলিশ কর্মচারীদের উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে। কিন্তু পুলিশ হুমকি দিতে থাকে— মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে জেলের ঘানি টানানো হবে। পরিবারের সদস্যদের শাসানি, প্রলোভন দেখানো, চাপ দেওয়া, এমনকি জোর করে সাদা কাগজে সই করানোরও চেষ্টা করে পুলিশ। বিষ্ণুর বৌদি মালতি কুমার সাংবাদিকদের জানান, পুলিশ গভীর রাতে টাকার থলি নিয়ে হাজির হয়। কিন্তু পরিবারের সদস্যরা নতিস্বীকার না করে বিচার ও দোষীদের শাস্তি চেয়েছেন।

পুলিশের এই ভূমিকার প্রতিবাদে ২১ জুলাই ৫ শতাধিক মানুষ ধিক্কার মিছিলে শামিল হন। ২৩ তারিখ স্বতঃস্ফূর্তভাবে আড়ষা বনধ পালন করেন এলাকার মানুষ। ব্যাঙ্কের সামনে মানুষ বনধের সমর্থনে উপস্থিত হলে ওই জমায়েতকে বেআইনি ঘোষণা করে সরে যাওয়ার সুযোগ না দিয়েই বিশাল পুলিশবাহিনী বেধড়ক লাঠিচার্জ ও ধরপাকড় শুরু করে। লাঠিচার্জে আহত হন অনেকে, গ্রেপ্তার করা হয় আন্দোলনের অন্যতম মুখ এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পুরুলিয়া দক্ষিণ জেলা কমিটির সদস্য কমরেড অনাদি কুমার, দলের কর্মী চণ্ডী কুমার সহ আরও চার জন প্রতিবাদী গ্রামবাসীকে। পুলিশ তাঁদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা সাজায়। ওই ৬ জন সহ ১৮ জনের নামে এফআইআর দায়ের করা হয়। গ্রেফতার হওয়া আন্দোলনকারীদের ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেয় জেলা আদালত। এখনও অন্য আন্দোলনকারীদের বাড়িতে বারবার হানা দিচ্ছে পুলিশ। পুলিশি হামলার কারণে আন্দোলনকারীদের অনেকেই বাড়িতে থাকতে পারছেন না। রুজি-রোজগার, চাষ-আবাদের কাজ সবই প্রায় বন্ধ। পুলিশ ও শাসক দলের এ হেন হাড় হিম করা সন্ত্রাসের মধ্যেও আড়ষার মানুষ সুবিচারের দাবিতে অনড়। তাঁদের এই সংগ্রামের পাশে শুধু আড়ষা থানার অন্যান্য গ্রামই নয়, পার্শ্ববর্তী থানার মানুষজনও এসে দাঁড়াচ্ছেন। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত এই আন্দোলন চলবে বলে জানিয়েছেন আন্দোলনকারীরা।

উলুবেড়িয়া মহকুমা শাসককে ডেপুটেশন পরিযায়ী শ্রমিকদের

ভিন রাজ্যে এ রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর চলা ক্রমবর্ধমান নির্যাতন-হেনস্থা বন্ধে এবং এ রাজ্যের বাসস্থানের স্থায়ী ঠিকানায় ভোটার তালিকায় পরিযায়ী শ্রমিকদের নাম বহাল রাখার দাবিতে ২৪ জুলাই উলুবেড়িয়া মহকুমা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। নেতৃত্ব দেন এ আই ইউ টি ইউ সি হাওড়া গ্রামীণ জেলা সম্পাদক নিখিল বেরা। উপস্থিত ছিলেন অল ইন্ডিয়া মাইগ্র্যান্ট ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য তপন বারিক ও লক্ষ্মণ বারিক।

সমস্ত পরিযায়ী শ্রমিকের নাম নথিভুক্ত করে সরকারি পরিচয়পত্র দেওয়া, বিডিও অফিসে পরিযায়ী শ্রমিকদের আপডেট রেকর্ড ও লগবুক সিস্টেম গড়ে তোলার দাবিতে, রোজগারহীন সকল পরিযায়ী শ্রমিকদের সরকারি ভাবে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার দাবিতে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। মহকুমা শাসক দাবিগুলি সহানুভূতির সঙ্গে দেখবেন বলে আশ্বাস দেন।

বাঁকুড়ায় ব্যাঙ্ককর্মীদের বিক্ষোভ

১৬ জুলাই স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার বাঁকুড়া রিজিওনাল অফিসের সামনে অল ইন্ডিয়া ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরামের সাধারণ সম্পাদক কমরেড জগন্নাথ রায়মণ্ডলের নেতৃত্বে ১১ দফা দাবি নিয়ে প্রবল বিক্ষোভ দেখান ব্যাঙ্ককর্মীরা।

ব্যাঙ্কের রিজিওনাল ম্যানেজার আন্দোলনকারী নেতৃত্বের সাথে আলোচনায় বসতে বাধ্য হন। আলোচনার মধ্য দিয়ে যে দাবিগুলি তিনি মেনে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন, সেগুলি হল—কোনও কর্মীকে ৮ ঘণ্টার বেশি কাজ করতে বাধ্য করবেন না, কোনও কর্মীকে অন্যায়ভাবে ছাঁটাই বা বদলি করবেন না, ব্যাঙ্কের কন্ট্র্যাক্ট কর্মীদের উপর হুমকি বা কোনও রকম মানসিক চাপ সৃষ্টি করবেন না, এটিএমে ডিউটিরত কর্মীদের স্বার্থে এটিএম সংলগ্ন টয়লেটের ব্যবস্থা করবেন, পিএফ-এর টাকা প্রতি মাসে যাতে পিএফ অ্যাকাউন্টে জমা পড়ে সেদিকে নজর রাখবেন, প্রত্যেকের ইএসআই কার্ড পাওয়ার ব্যাপারটা সুনিশ্চিত করবেন, সমস্ত কর্মী যাতে সময়মতো মজুরি পান তা সুনিশ্চিত করবেন, সময়মতো প্রতিটি কর্মী যাতে পোশাক পান, তা লক্ষ রাখবেন।

ওন্দায় বিদ্যুৎ গ্রাহক আন্দোলনের জয়

বাঁকুড়ার ওন্দায় বিদ্যুৎ দফতর কৃষি, ধানকল, গমকল, ইটভাটা ও গৃহস্থ সহ শতাধিক গ্রাহকের জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সরবরাহের ৬৩ কেভির ট্রান্সফর্মারের বদলে ২৫ কেভির ট্রান্সফর্মার বসানোয় সেটিতে বারে বারে বিস্ফোরণ হচ্ছে। বিদ্যুৎ বিপর্যয়ে অন্ধকারে একদিকে বিষধর সাপের উৎপাত, অন্য দিকে পানীয় জলের সমস্যা চলছে মাসাধিক কাল ধরে। এই অব্যবস্থার বিরুদ্ধে অ্যাবেকার নেতৃত্বে বিদ্যুৎ গ্রাহকরা ২২ জুলাই ওন্দা বিদ্যুৎ অফিস অবরোধ করেন। বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন অ্যাবেকার জেলা সম্পাদক স্বপন নাগ, কৃষ্ণশংকর বিশ্বাস ও দেবব্রত পাত্র । দীর্ঘক্ষণ ধরে বিক্ষোভ চলার পর সমস্যা সমাধানে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন কর্তৃপক্ষ।

বাঁশদ্রোণী থানায় বিক্ষোভ ছাত্র-যুব-মহিলাদের

কলকাতায় বাঁশদ্রোণীর ১১৩ নম্বর ওয়ার্ডে শাসক তৃণমূল কংগ্রেস ঘনিষ্ঠ এক অধঃপতিত লম্পট ব্যক্তি তার ১৩ বছরের মেয়ের উপর যৌন নির্যাতন চালায়। এই ন্যক্কারজনক ঘটনার প্রতিবাদে এবং অপরাধীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে ২৪ জুলাই এআইডিএসও, এআইডিওয়াইও এবং এআইএমএসএস-এর পক্ষ থেকে বাঁশদ্রোণী থানায় বিক্ষোভ দেখানো হয়। সরকারি মদতে মদের প্রসার এবং নৈতিকতার চরম অবক্ষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে এই ধরনের ঘটনার বাড়বৃদ্ধিতে উদ্বেগ প্রকাশ করেন সংগঠন তিনটির নেতৃবৃন্দ। থানায় দাবি জানান— এলাকায় মদ বিক্রি বন্ধ করতে পুলিশকে কার্যকরী ভূমিকা নিতে হবে।

৫ আগস্টের সমাবেশে

একের পাতার পর

কোনও রাজনৈতিক সমাবেশে যোগ দেওয়ার আগে এমন করে গভীর মনোযোগে তার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে চাইছেন শ্রমিক, কৃষক, অফিস কর্মচারী, পরিচারিকা, ছাত্র, গবেষক, চিকিৎসক সহ সব স্তরের, সব পেশার মানুষ— এমনটা তো অন্য ক্ষেত্রে ঘটে না! সেখানে নেতারা ডাকেন, মানুষ যোগ দেন। এ ক্ষেত্রে ডাকটা যে ছুঁয়ে যাচ্ছে খেটে খাওয়া এই মানুষগুলির অন্তরকে!

১৯৭৬-এর ৫ আগস্ট, জীবনাবসান হয়েছিল এই যুগের বিশিষ্ট মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক সর্বহারা শ্রেণির মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের। তারপর এক এক করে ৫০টা বছর চলে গেছে, ৫ আগস্ট দিনটা ফিরে এসেছে বারবার। তাঁকে স্মরণ করতে গিয়ে একদিকে গভীর ব্যথা, অন্য দিকে তাঁর চিন্তাধারার সার্থক রূপায়ণের মাধ্যমে শোষণের শৃঙ্খল ছিন্ন করার কর্ম যজ্ঞে আত্মনিয়োগের প্রেরণা মথিত করেছে অসংখ্য মানুষের হৃদয়। মানুষের জীবনে সংকট বেড়ে চলেছে প্রতিদিন। অর্থনৈতিক সংকট, কাজ পাওয়ার সংকট এমন হরেক সংকটের সাথে যোগ হয়েছে পরিবারের মধ্যেকার সম্পর্ক, সন্তানকে মানুষ করার প্রশ্নে সংকট। এই সংকট থেকে রেহাই পাওয়ার রাস্তা কোথায়? আজকের সামাজিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক সংকটের মূল উৎস যে পুঁজিবাদী সমাজ ও তার শোষণ— এই সত্যটা দেখিয়েছে বৈজ্ঞানিক দর্শন মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ। কিন্তু শুধু এই সত্য জানলেই তো হয় না, তাকে বিশেষ দেশে বিশেষ সময়ের প্রেক্ষিতে সুনির্দিষ্ট করে বোঝা এবং সফলভাবে প্রয়োগ করার কাজটা না করলে চলে না। সেই কাজটা রাশিয়াতে করে দেখিয়েছিলেন লেনিন। তাঁর পরবর্তী সময়ে এই ভূমিকা নিয়েছেন স্ট্যালিন, চিনে এই কাজ করেছেন মাও সে তুঙ। তার মধ্য দিয়ে তাঁরা নিজের দেশের শুধু নয় বিশ্বের সর্বহারা শ্রেণিকে শক্তি দিয়েছেন এগিয়ে চলার রাস্তা খুঁজে নেওয়ার। তাঁদেরই সুযোগ্য উত্তরসাধক শিবদাস ঘোষ এই কাজটাই করেছেন ভারতে।

• *ফোমা রাবার কোম্পানি শ্রমিকদের বৈঠক। ট্যাংরা, কলকাতা*

কমরেড শিবদাস ঘোষ এই দেশের বুকে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের বিজ্ঞানকে প্রয়োগ করে একটা নতুন জাতের পার্টি, জাতবিপ্লবী হওয়ার মতো উন্নত চরিত্রের একদল নেতা-কর্মী গড়ে তোলার কাজে প্রথম নজর দেন। রাজনীতি যে একটা উচ্চ হৃদয়বৃত্তি এবং বিপ্লবী রাজনীতি যে উচ্চতর হৃদয়বৃত্তির কারবার, কথাটা এই দেশের রাজনীতির ময়দানে প্রথম তুলে ধরলেন তিনি। তাঁর হাতে গড়া দল এস ইউ সি আই (সি)-র মধ্যে তিনি এর চর্চা নিয়ে এলেন অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে। রাজনীতির আদর্শটা উন্নত হলে তার সংস্পর্শে আসা মানুষগুলোও উন্নত মূল্যবোধ, উন্নত সংস্কৃতির আধারে গড়ে উঠতে বাধ্য। না হলে বুঝতে হবে রাজনীতির নামে যত বড় বড় কথাই বলা হোক না কেন, সেই রাজনীতিটা শেষপর্যন্ত মানুষের সর্বনাশই ডেকে আনে, এই ছিল তাঁর শিক্ষা। আজকের দিনের রাজনীতিবিদ হিসাবে যাদের ছবি রোজ কাগজে ছাপা হয় তাদের সাথে মিলিয়ে দেখলে একেবারে পরিষ্কার হয়ে যায় এই কথাগুলো।

আজ সাম্প্রদায়িকতার বিষ সারা দেশেই বহু মানুষের মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে। এই সাম্প্রদায়িক সমস্যার মূল কারণ এবং তার সমাধানের রাস্তা তুলে ধরে ১৯৬৪-তে কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছিলেন, গণতান্ত্রিক আন্দোলনে, বামপন্থী আন্দোলনে সামাজিক বিপ্লবের কর্মসূচিকে যথাযথভাবে গ্রহণ করে তাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যমেই সাম্প্রদায়িক শক্তির মোকাবিলা সম্ভব। স্বাধীনতা লাভের পর সিপিআই-এর নেতারা যখন ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণির নবগঠিত রাষ্ট্রটির সঠিক চরিত্র বুঝতে অক্ষম হয়ে তার নানা রকম ব্যাখ্যা দিচ্ছেন, নিজেদের মনগড়া ধারণাকে প্রতিষ্ঠা করতে মার্ক্স লেনিনের উদ্ধৃতি খুঁজে হয়রান হচ্ছেন, সেই সময় মার্ক্সবাদের সঠিক উপলব্ধির ভিত্তিতে এই রাষ্ট্রব্যবস্থাটির প্রকৃত চরিত্র তুলে ধরেছিলেন কমরেড শিবদাস ঘোষই। তিনি সিপিআই নেতৃত্বের বিভ্রান্তিকে স্পষ্ট করে তুলে দেখিয়েছিলেন ভারতবাসী রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেলেও আসেনি গণমুক্তি। ফলে পুঁজিবাদের শোষণ থেকে ভারতের শ্রমিক, কৃষক সহ সমস্ত খেটে খাওয়া মানুষের মুক্তির প্রয়োজনে আজ আর একটা লড়াই পরিচালনা করতে হবে এ দেশের বুর্জোয়া শ্রেণির বিরুদ্ধে। তিনি দেখিয়েছেন ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণি একচেটিয়া পুঁজির জন্ম দিয়েছে অনেক আগেই এবং সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র অর্জন করেছে স্বাধীনতা লাভের প্রায় পরে পরেই। তিনি তুলে ধরেছিলেন, এই পুঁজিবাদী শোষণের প্রকৃত রূপ। দেখিয়েছিলেন শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজের জন্য বিপ্লবী লড়াইয়ের সুনির্দিষ্ট রাস্তা। এই বিপ্লবের প্রয়োজনের সাথে তাঁর সমস্ত সত্তা হয়ে উঠেছিল এক এবং অভিন্ন।

আজকের ভারতে সমস্ত স্তরের সাধারণ মানুষের জীবনের সমস্যাগুলি সমাধানের দাবিতে গণআন্দোলনের সাথে কমরেড শিবদাস ঘোষের হাতে গড়া দলটির নাম এক হয়ে গেছে। এই মহান নেতা গণআন্দোলনের সঠিক পথ নিরূপণ করেছিলেন বলেই আজ তা সম্ভব হয়েছে। আজকের ভারতে ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলন, সাধারণ মানুষের শিক্ষা-স্বাস্থ্য-গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার আন্দোলন থেকে শুরু করে যে কোনও গণআন্দোলনকে সঠিক দিশায় পরিচালিত করা, তাকে ভোট-রাজনীতির চক্করে ফাঁসিয়ে দেওয়ার চক্রান্তকে ব্যর্থ করে দিয়ে শাসকশ্রেণির প্রকৃত স্বরূপ চিনতে সাহায্য করার কাজটা কেমন করে করতে হয়, তার সন্ধান আছে কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষাতেই। তিনি দেখিয়েছিলেন, আজ পরিবারের মধ্যে সম্পর্কগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বলে মানুষ আক্ষেপ করে। কিন্তু এই সম্পর্ককে সুন্দর রাখতে যে স্বার্থপরতা-মুক্ত মন প্রয়োজন তা আজকের সমাজপরিবেশে গড়ে তুলতে পারে কারা? এ কাজ একমাত্র তাদের পক্ষেই সম্ভব যারা এই অসুস্থ সমাজ পরিবেশের বিরুদ্ধে লড়তে এগিয়ে আসবে, সমাজের সামগ্রিক স্বার্থের সাথে ব্যক্তি-স্বার্থকে মিলিয়ে দেওয়ার জন্য সংগ্রাম করবে। এই সংগ্রামকে এড়িয়ে আজ কোনও মানুষই একা একা যথার্থ শান্তির জীবন যাপন করতে পারে না।

শিলিগুড়িতে প্রস্তুতিসভায় বক্তব্য রাখছেন কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য

বর্তমান সময়ে শাসক দল বিজেপি নতুন করে ভারতের বুকে যুদ্ধ উন্মাদনার জিগির তুলছে, জনগণের সমস্ত সমস্যাকে চাপা দিতে তাদের দৃষ্টি অন্য দিকে ঘুরিয়ে রাখার জন্য যুদ্ধাস্ত্র তৈরি আর সামরিক প্রয়োজনকেই একমাত্র জরুরি বলে মানুষের সামনে তুলে ধরছে। আর একদিকে ভাষা এবং ধর্মের ভিত্তিতে বিদ্বেষ ছড়িয়ে মানুষের ওপর নামিয়ে আনছে অত্যাচার। ফ্যাসিস্ট স্বৈরাচারী শাসন কায়েমের জন্য তারা সমস্ত দিক থেকে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে আবার শরণাপন্ন হতে হয় কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার কাছে। এ দেশের স্বাধীনতার কিছু দিন পরেই তিনি ফ্যাসিবাদের স্বরূপ আজকের দিনে কী, তা সুনির্দিষ্ট করে তুলে ধরেছেন। শুধু স্বৈরাচার আর গায়ের জোরের শাসনকে দেখিয়ে ফ্যাসিবাদকে ব্যাখ্যা করা যায় না। সংস্কৃতি, শিক্ষা ক্ষেত্র, মানসিক জগতে যে আক্রমণ ফ্যাসিবাদ নামিয়ে আনে তাকে সঠিকভাবে চেনা দরকার। তিনি দেখালেন, "ফ্যাসিবাদ হল অধ্যাত্মবাদ ও বিজ্ঞানের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ। এতে জাতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের নামে একই সঙ্গে থাকে ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তিকে বাড়িয়ে তোলার স্বার্থে বিজ্ঞানের কারিগরি দিককে গ্রহণ করার কর্মসূচি এবং সমস্ত রকম অবৈজ্ঞানিক ধর্মীয় উন্মাদনা ও ভাববাদী ভোজবাজিকে (idealistic jugglery) শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এবং বর্তমান সমাজের আনুষঙ্গিক কুফলগুলি থেকে পরিত্রাণের সর্বরোগহর ঔষধ হিসাবে পরিবেশন করার চেষ্টা" (সময়ের আহ্বান, নির্বাচিত রচনাবলি দ্বিতীয় খণ্ড)। শাসক শ্রেণির অর্থনীতির সামরিকীকরণের পরিকল্পনাকে তুলে ধরে তিনি দেখিয়েছেন, "মিলিটারি খাতে ব্যয়বৃদ্ধি করে সঙ্কুচিত অভ্যন্তরীণ বাজারের কৃত্রিম তেজিভাব বজায় রাখার এবং ভারতবর্ষের সামরিক শক্তিকে বাড়িয়ে তোলার প্রয়োজনেই ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণি যত দীর্ঘ সময় সম্ভব চিনের সাথে সীমান্ত সমস্যা, পাকিস্তানের সঙ্গে কাশ্মীর সমস্যা এবং অন্যান্য প্রতিবেশী দেশের সাথে তার নানা বিতর্কিত বিষয়কে জিইয়ে রাখার পথে যেতে বাধ্য হচ্ছে। এটাই স্বাভাবিক যে অর্থনীতির সংকট যত তীব্র হবে, জনসাধারণের দৃষ্টি অন্যত্র সরিয়ে দিতে এবং অস্ত্র প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যেতে শাসক শ্রেণি তত বেশি এই সমস্ত বিষয় নিয়ে হইচই করবে"।

জ্ঞান জগতের পরিমণ্ডলে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সমাধানে তিনি মার্ক্সবাদী বিজ্ঞানের আলোকে নতুন পথনির্দেশ রেখে গেছেন, যা আগামী দিনে বিজ্ঞানের সুস্পষ্ট ধারণার প্রয়োজনে ব্যবহৃত হবে বহু কাল। ব্যক্তির মুক্তি, ব্যক্তিত্বের সমস্যা ইত্যাদি যে বিষয়গুলি নিয়ে বর্তমান বুর্জোয়া সমাজ সংকটে, সমাজমুক্তির সংগ্রামে ব্যক্তির ভূমিকা এবং তার স্বাধীনতার সীমারেখা ঠিক কোথায় এই প্রসঙ্গে সঠিক গাইডলাইন দিয়েছেন তিনি।

কমরেড শিবদাস ঘোষ যে দিন ভারতের বুকে একটি সঠিক কমিউনিস্ট দল গঠনের সংগ্রাম শুরু করেছিলেন, তখন তিনি বয়সে তরুণ। সাথে মুষ্টিমেয় আরও কয়েকজন যুবককে নিয়ে তাঁর পথচলা শুরু। সে দিন আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট নেতৃত্বের স্বীকৃতি নিয়ে দাঁড়িয়েছিল বিরাট দল সিপিআই। ছিল আরও কিছু দল ও তাদের নামডাকওয়ালা নেতারা। সে দিন শিবদাস ঘোষ ও তাঁর সঙ্গীরা ছিলেন সহায় সম্বলহীন, আশ্রয়হীন, অখ্যাত। তাঁদের একটিই সম্বল— মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের সঠিক উপলব্ধি। এর জোরেই বিজ্ঞান, সমাজ সহ মানবজীবনের এমন কোনও ক্ষেত্র নেই যেখানে তিনি অবদান রাখেননি। তিনি বলতেন, "এই লড়াই করতে গিয়ে যদি না খেতে পেয়ে রাস্তায় আমি মারাও যাই, আমি মাথা উঁচু করে মরব— আমাকে গুলি করে মারা যাবে কিন্তু আমাকে কেনা যাবে না।" সমাজবিপ্লবের সাথে সম্পূর্ণ সম্পৃক্ত এই মহান নেতা বলতেন, "আমার বেঁচে থাকার একটিই মানে, আমি বিপ্লবী হিসাবে বেঁচে আছি"। এই সংগ্রামের মধ্য দিয়েই তিনি ভারতের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী কর্মপ্রচেষ্টার প্রতীকে পরিণত হয়েছেন। বলেছিলেন, কিছু না পারি বিপ্লবের জন্য একটা ইট গেঁথে রেখে যাব, যদিও তিনি গড়ে দিয়ে গেছেন এস ইউ সি আই (সি) নামে বিপ্লবী দলটির ইমারত। ৫ আগস্ট এই মহান নেতার ৫০তম স্মরণ দিবসে তাই দেশ জুড়ে শপথ নেবেন হাজার হাজার মুক্তিকামী মানুষ। তাঁর আহ্বান ছিল—"মনে রাখবেন, ... মর্যাদা নিয়ে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকা বা মৃত্যুকে বরণ করার একটাই মাত্র নিশ্চিত পথ রয়েছে। তা হল, সমাজের আমূল পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে জনসাধারণের যে বিপ্লবী সংগ্রাম তাতে নিজেকে সক্রিয়ভাবে নিয়োজিত করা।" রাজ্যে রাজ্যে সমবেত মানুষ শপথ নেবেন — হৃদয়ের গভীর আবেগ ও বেদনাকে শক্তিতে পরিণত করে আমরা কমরেড শিবদাস ঘোষের এই অমোঘ আহ্বানের মূল্য দেব।

পাঠকের মতামত

অগোছালো রিপোর্টিং

আমি ‘গণদাবী’ পত্রিকার একজন নিয়মিত পাঠক। বেশিরভাগ সময়ই এই পত্রিকায় প্রকাশিত প্রত্যেক প্রবন্ধের গুণমান থাকে অত্যন্ত উৎকৃষ্ট। লেখার বিষয়বস্তু স্বাভাবিকভাবেই বাজারে চলতি পত্র-পত্রিকার থেকে পৃথক। উন্নত চিন্তা ও আদর্শকে লেখার মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলতে গেলে যেরূপ দক্ষতার প্রয়োজন, ‘গণদাবী’ পত্রিকা পাঠ করে নিশ্চিতরূপেই তার ছোঁয়া পাওয়া যায়। প্রবন্ধগুলো থাকে অত্যন্ত সুসজ্জিত ও স্বচ্ছ, ভাষা থাকে মার্জিত, সুস্পষ্ট ও বলিষ্ঠ। ‘গণদাবী’ পত্রিকা পাঠের মাধ্যমে দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছ মতামত গড়ে তোলা ও তাকে বহিঃপ্রকাশের জন্য নিজের ভাষা ও কলমকে আরও শাণিত করা যায়।

কিন্তু ৭৭ বর্ষ ৪৯ সংখ্যায় প্রকাশিত ‘৯ জুলাই ধর্মঘটের সমর্থনে সর্বত্র পথে নেমেছেন মেহনতি মানুষ’ রিপোর্টটি যেন ‘গণদাবী’ পত্রিকার সমস্ত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যেরই বিপরীত। বিভিন্ন জেলার অগোছালো রিপোর্টিংয়ের সমাবেশ লেখাটি। বিভিন্ন সংবাদ চ্যানেলে দিনের শেষে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য ঝড়ের বেগে রাজ্য বা দেশজুড়ে ঘটে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ আউড়ে চলার মতো উক্ত রিপোর্টটিও সংবাদ পরিবেশনের মাধুর্য হারিয়ে ফেলেছে। ‘গণদাবী’-র কাছে আমাদের অনেক আশা রেখেই আমার এই মতামত ব্যক্ত করলাম।

অভিজিৎ সান্যাল, শিলিগুড়ি

ভারত বা পাকিস্তান
সাধারণ মানুষের দুর্দশায় তফাৎ কই?

সম্প্রতি বিশ্বব্যাঙ্কের এক সমীক্ষায় পাকিস্তানের দারিদ্রের ভয়াবহ ছবি উঠে এসেছে। সমীক্ষা থেকে জানা যাচ্ছে, পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৪৪.৭ শতাংশ মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে জীবনযাপন করছেন। সে দেশের ১৬.৫ শতাংশ মানুষ বর্তমানে চরম দারিদ্রের মধ্যে রয়েছেন। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, দু’বেলা দু’মুঠো খাবার জোটাতে রীতিমতো নাভিশ্বাস উঠছে সে দেশের বহু সাধারণ নাগরিকের। বেকারির সাথে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে মুদ্রাস্ফীতি। সংসার চালাতে কেউ আত্মীয়-পরিজনের কাছে হাত পাতছেন, আবার কেউ একসাথে দু’টি চাকরি করতে বাধ্য হচ্ছেন।

পাকিস্তানে দারিদ্রের এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সাথে ভারতের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির যে অনেক সাদৃশ্য আছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। দুই দেশের শোষিত-বঞ্চিত সংখ্যাগরিষ্ঠ মেহনতি মানুষের যে সত্যিকার অর্থে বিশেষ পার্থক্য নেই, তা বুঝতে অর্থনীতি শাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন হয় না।

পাকিস্তানের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সাথে ভারতের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সাদৃশ্যের কথায় অবশ্য অনেকে রে রে করে উঠতে পারেন। তাঁরা গত ২২ এপ্রিল প্রকাশিত বিশ্বব্যাঙ্কের সমীক্ষার তথ্য তুলে ধরবেন, যেখানে বলা হয়েছে ২০১১-১২ অর্থবর্ষে ভারতে দারিদ্রের হার ছিল ২৭.১ শতাংশ, ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে সেই দারিদ্রের হার নেমে এসেছে ৫.৩ শতাংশে। চরম দরিদ্র (প্রতিদিন ২.১৫ ডলারের কম আয়ে জীবনযাপন) ২০১১-১২ অর্থবর্ষে ১৬.২ শতাংশ থেকে কমে ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে ২.৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এমন চমৎকার খবরে দেশের নাগরিকদের আনন্দিত হওয়ার কথা। কিন্তু গোল বেধেছে বিশ্বব্যাঙ্কেরই অক্টোবর ২০২৪-এর প্রকাশিত তথ্যে। সেখানে বলা হয়েছে ২০২১-২২ অর্থবর্ষে ভারতের জনসংখ্যার ১২.৯ শতাংশ চরম দারিদ্রসীমার নিচে ছিল। মাত্র একটি বছরের মধ্যে দারিদ্রসীমার নিচে থাকা মানুষের সংখ্যা এতখানি কমে যাওয়া শুধু বিস্ময়কর না, বিরলতম ঘটনা। এর কারণ হিসাবে অনেক বিশেষজ্ঞই ওই দুই বছরে দারিদ্রসীমা মাপার পদ্ধতির পার্থক্যের কথা তুলে ধরেছেন।

অন্যান্য সমসাময়িক সমীক্ষার তথ্যের সাথে বিশ্বব্যাঙ্কের ২২ এপ্রিল প্রকাশিত সমীক্ষার কোনও যৌক্তিক মিল নেই। অক্সফ্যামের ২০২১-এর প্রতিবেদন থেকে জানা যায় দেশের শীর্ষ ১ শতাংশ মানুষ দেশের সম্পদের ৪০.৫ শতাংশের, আর নিচের ৫০ শতাংশ মানুষ মাত্র ৩ শতাংশের মালিক। আবার ২০২৪ সালে প্রকাশিত বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে ১২৭টি দেশের মধ্যে ভারত ছিল ১০৫তম স্থানে। এই রিপোর্ট অনুযায়ী, দেশের মোট জনসংখ্যার ১৩.৭ শতাংশের বেশি অপুষ্টির শিকার। অর্থাৎ এক দিকে মুষ্টিমেয় মানুষের বিপুল প্রাচুর্য, অন্য দিকে সীমাহীন দারিদ্রের নিষ্ঠুর চিত্র।

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ মন্ত্রী নীতিন গডকড়ির বক্তৃতাতেও অক্সফ্যাম রিপোর্টের প্রতিধ্বনি শোনা গেছে। মন্ত্রী মহোদয় ১২ জুলাই নাগপুরের এক অনুষ্ঠানে বলেছেন, ধীরে ধীরে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বাড়ছে এবং দেশের যাবতীয় সম্পদ কিছু ধনী ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, অনিয়ন্ত্রিত সম্পদ কেন্দ্রীকরণ চিন্তার বিষয়। পাকিস্তানের অর্থনৈতিক অবস্থার সাথে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থার সাদৃশ্য তুলে ধরায় যারা তেলেবেগুনে জ্বলে উঠেছেন, সড়ক পরিবহণ মন্ত্রীর বক্তৃতা যে তাদের বাড়া ভাতে ছাই দেবে তা বলাই বাহুল্য। ধর্মের কল বোধহয় এ ভাবেই বাতাসে নড়ে!

জিশু সামন্ত, খানাকুল, হুগলি

জীবনাবসান

বীরভূমে দলের রামপুরহাট লোকাল কমিটির আবেদনকারী সদস্য কমরেড মহিউদ্দিন মণ্ডল আকস্মিক হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ২০ জুলাই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। দীর্ঘদিন তিনি ক্যান্সার সহ নানা অসুখ ও বার্ধক্যজনিত কারণে প্রায় শয্যাগত ছিলেন। শোকসংবাদ পেয়ে দলের কর্মী, সমর্থক, দরদি ও বহু সাধারণ মানুষ তাঁর বাড়িতে পৌঁছান এবং মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান। জেলা সম্পাদক কমরেড মদন ঘটকের পক্ষ থেকেও মাল্যদান করা হয়।

কমরেড মহিউদ্দিন মণ্ডল ’৬৯-’৭০ সাল নাগাদ প্রয়াত সংগঠক কমরেড মনসুর আহমেদের মাধ্যমে দলের সংস্পর্শে আসেন এবং মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক চিন্তায় আকৃষ্ট হন। দলের প্রয়োজনে বিভিন্ন সময়ে তিনি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন। এক সময় রামপুরহাট শহরে তাঁর বাড়িটি ছিল পার্টির আশ্রয়স্থল। দলের উদ্যোগে গড়ে ওঠা প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি চালুর আন্দোলন সহ দলের স্থানীয়, জেলা এবং রাজ্যের বিভিন্ন কর্মসূচিতে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন তিনি। বিদ্যুৎ গ্রাহক আন্দোলনেও তিনি ভূমিকা নিয়েছেন। পরে নিয়মিত দলের কাজকর্ম করতে না পারলেও যে কোনও প্রয়োজনে সাহসের সাথে দলের পাশে দাঁড়িয়েছেন। রামপুরহাট পার্টি অফিস, বাড়ির মালিক তৃণমূল আশ্রিত গুণ্ডাবাহিনী ও পুলিশ-প্রশাসনের সাহায্যে ভাঙতে এলে অফিস রক্ষা করার জন্য কমরেডরা যখন সাহসের সাথে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন, সেখানে তাঁর ভূমিকাও ছিল গুরুত্বপূর্ণ। কয়েক বছর আগে থেকেই বয়স এবং শারীরিক নানা সমস্যার কারণে দলের কাজে তেমনভাবে অংশ নিতে পারতেন না, কিন্তু নিয়মিত খোঁজখবর রাখতেন। দলের পত্রপত্রিকা পড়তেন। পড়াশুনার প্রতি তাঁর অত্যন্ত আগ্রহ ছিল। দলের অগ্রগতির সংবাদে খুবই উৎসাহিত হতেন। কর্মীদের প্রতি ছিলেন স্নেহশীল। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে দল একজন নির্ভরযোগ্য সাথীকে হারাল।

কমরেড মহিউদ্দিন মণ্ডল লাল সেলাম

বিজেপিশাসিত উত্তরপ্রদেশে ১০,৭৮৪টি প্রাইমারি স্কুল বিলুপ্তির পথে

উত্তরপ্রদেশের বিদ্যালয় শিক্ষার ডিরেক্টর জেনারেল কাঞ্চন ভার্মা সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, রাজ্যের ১ লাখ ৩২ হাজার সরকারি স্কুলের মধ্যে ১০,৭৮৪টি প্রাইমারি স্কুল অন্য স্কুলের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। কেন এতগুলি স্কুলের বিলুপ্তি? মূলত ছাত্রসংখ্যা কমে যাওয়া এবং দুর্বল পরিকাঠামোর জন্যই এই স্কুলগুলিকে নিকটতম বড় স্কুলের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হচ্ছে বলে দাবি করা হচ্ছে।

ছাত্রসংখ্যা কমছে কেন? কেনই বা স্কুলের পরিকাঠামো দুর্বল? ছাত্র কমে যাওয়ার সমাধান কি স্কুল তুলে দেওয়া! দ্রুত স্কুলের পরিকাঠামোর উন্নতি ঘটিয়ে স্কুলছুট ছাত্রদের স্কুলে ফেরানোর সব রকম চেষ্টা করাই কি একটা দায়িত্বশীল সরকারের কর্তব্য নয়? উত্তরপ্রদেশ তো বিজেপির বহুঘোষিত ডবল ইঞ্জিন সরকারের রাজ্য! তা হলে সেই রাজ্যের শিশুদের শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সরকারের ইঞ্জিনে তেল এত কম পড়ছে কেন?

আসলে স্কুল সংযুক্তির নামে রাজ্যে রাজ্যে স্কুল তুলে দেওয়ার পদক্ষেপ শুরু হয়েছে জাতীয় শিক্ষানীতির সুপারিশ মেনেই। এতে বলা হয়েছে, শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সম্পদ এবং সুযোগ সুবিধার অংশীদার করতেই এই ধরনের সংযোজন বা সমন্বয়। যদি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সুযোগ-সুবিধা ছাত্রছাত্রীদের কাছে পৌঁছে দিতে হয়, তার জন্য কি একটা স্কুল তুলে দিয়ে আরেকটা স্কুলের সাথে জুড়ে দিতে হবে? একটি স্কুলে যা অতিরিক্ত সুবিধা আছে, আরেকটি স্কুলেও তা চালু করার পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না কেন?

এর ফল কী দাঁড়াচ্ছে? বাড়ির কাছাকাছি স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়াতে ছাত্রদের একটা বড় অংশ পড়া ছেড়ে দিচ্ছে। এর শিকার হচ্ছে মূলত গরিব ও নিম্ন আয়ের পরিবারগুলি। বিশেষ করে দলিত এবং মুসলিম পরিবারের মেয়েরা শিক্ষার জগৎ থেকে ছিটকে যাচ্ছে। কার্যত শিক্ষার অধিকার আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বিজেপি নেতৃত্বাধীন যোগী সরকার এই বেআইনি কাজটিই করে চলেছে। সরকারের এই ভূমিকায় বেসরকারি স্কুলের বাজার আরও খুলে গিয়েছে। বহু পরিবার ঘটিবাটি বিক্রি করে হলেও শিক্ষার কথা ভেবে সন্তানদের বেসরকারি স্কুলে পাঠাতে বাধ্য হচ্ছে। স্কুল বন্ধের অভিযানে উত্তরপ্রদেশ জুড়ে শিক্ষানুরাগী মানুষের মনে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। লক্ষ্ণৌতে ১৫৪টি প্রাইমারি স্কুলের বিলুপ্তি ঘটেছে। লক্ষ্ণৌতে মালিহাবাদ তহশিলের পাহাড়পুরে একটি স্কুলকে ৩ কিলোমিটার দূরের একটি স্কুলের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। অথচ শিক্ষার অধিকার আইন অনুযায়ী শিশুর বাড়ি থেকে এক কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে স্কুল থাকা বাধ্যতামূলক। শিক্ষা থেকে বঞ্চিত এই শিশুরাই বাড়াচ্ছে শিশুশ্রমিকের সংখ্যা। যাদের জ্ঞানার্জন করার কথা, যারা সমাজে অনেক অবদান রেখে যেতে পারত, সরকারের ভূমিকায় সেই সব সম্ভাবনার মৃত্যু ঘটছে। একই সঙ্গে সৃষ্টি হচ্ছে বহু সামাজিক সঙ্কটের। এর ফলে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত মেয়েদের মধ্যে অবধারিত ভাবে বাড়বে বাল্যবিবাহের সমস্যা।

অন্য দিকে হাজার হাজার শিক্ষক, শিক্ষামিত্র উদ্বৃত্ত হবেন, তাঁদের কাজ কতদিন থাকবে কেউ জানে না। ইতিমধ্যে শিক্ষক সংগঠনগুলি এর প্রতিবাদে পথে নেমেছে। তারা এলাহাবাদ হাইকোর্টে মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

শুধু উত্তরপ্রদেশেই নয়, বহু রাজ্যে স্কুল বিলোপ একটা মারাত্মক সমস্যা হিসাবে এসেছে। পশ্চিমবঙ্গও তার বাইরে নয়। তৃণমূল সরকারের শাসনে এ রাজ্যের প্রতিটি জেলায় বহু সংখ্যক স্কুল তালিকাবদ্ধ হয়েছে বিলুপ্তির জন্য। এ রাজ্যে ৮ হাজার স্কুল বন্ধ করা হয়েছে। কেন্দ্রের শাসক দল, রাজ্যের শাসক দল এ ভাবেই জনশিক্ষা নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও দীর্ঘ দিন ধরে স্কুল অবলুপ্তির তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে পথে নেমেছে। অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটি জাতীয় শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমেছে। কমিটি যথার্থই বলেছে, সরকারি শিক্ষার এই পরিকল্পিত সমাধি ঘটানো হচ্ছে বেসরকারি শিক্ষা-ব্যবসার বাজার সম্প্রসারণ ঘটাতেই। একে রুখতে হলে সর্বত্র আন্দোলনের কমিটি গঠন করে প্রতিবাদে সোচ্চার হতে হবে।

শুল্কযুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী সংকটের পরিণাম

কথা না মানলে ভারতের অর্থনীতিকে একেবারে ‘ধ্বংস’ করে দেবেন বলে হুমকি দিয়েছেন তিনি। না, পাড়ার বখাটে কোনও ছেলের হুমকি এটা নয়, হুমকিদাতা খোদ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাই দুশ্চিন্তার বিষয় তো নিশ্চয়ই।

সম্প্রতি ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরো-তে অনুষ্ঠিত হয়েছে ব্রিকস সম্মেলন। সম্মেলন চলাকালীনই ট্রাম্পের হুমকি-ঘোষণা মার্কিন বিরোধী নীতির সঙ্গে যুক্ত থাকলেই চাপ বাড়বে অতিরিক্ত শুল্কের।

এ বারের সম্মেলনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সহ রাশিয়া, চিন, দক্ষিণ আমেরিকা, মিশর, সংযুক্ত আমিরশাহি সহ শরিক দশটি দেশেরই তাবড় নেতারা উপস্থিত ছিলেন। ব্রিকস-কে জি-৭ এর প্রতিপক্ষ হিসাবে উপস্থাপনার প্রচেষ্টা ছিল লক্ষ করার মতো। কাল-বিলম্ব না করে সেই প্রচেষ্টায় কার্যত জল ঢেলে দিতে চেয়ে মহা দাপটে উপস্থিত হলেন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের শিরোমণি ট্রাম্প। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ট্রাম্পের পাশাপাশি হেঁটে বা বুকে জড়িয়ে ধরে নিজেকে বিশ্বের অন্যতম প্রধান নেতা হিসাবে যতই জাহির করার চেষ্টা করুন, অবস্থাটা দাঁড়িয়েছে এমনই যে, এ যাবত তিনি অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও মহল থেকেই ট্রাম্পের হুমকির প্রতিবাদে টুঁ শব্দও উচ্চারিত হয়নি। খোলসা করে ট্রাম্প বলে দিয়েছেন, রাশিয়ার সঙ্গে সব বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন না করলে তিনি ‘ধ্বংস’ করে দেবেন ভারত, চিনের মতো ‘রুশ সহযোগী’ দেশগুলির অর্থনীতি। সোজা কোথায়, সকল দেশকে ‘মার্কিন সহযোগী’ হতে হবে। কার্যত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পদতলে নতজানু হওয়ার ধমকি। কোথায় গেল ৫৬ ইঞ্চিছাতির বিশ্বগুরুর নেতৃত্বে ভারতীয় জিডিপির চ্যাম্পিয়নশিপ, আর কোথায় গেল বহু ঘোষিত বিশ্বায়নের অবাধ বাণিজ্য পরিস্থিতি?

বাস্তবে সোভিয়েট ইউনিয়ন, চিন সহ পূর্ব ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাময়িক বিপর্যয় তথা সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে সাম্রাজ্যবাদের শিরোমণি দেশগুলি সীমাহীন লুণ্ঠনের স্বর্গরাজ্য গড়ে তুলেছে। আর সমাজতন্ত্রের পরিবর্তে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে অতি দ্রুত রাশিয়া ও চিন কেবল সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র অর্জন করে ফেলেছে তাই নয়, বিশ্বে অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গেছে। বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা কমরেড লেনিন সাম্রাজ্যবাদের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে দেখিয়েছিলেন, একদিকে বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি পারস্পরিক দ্বন্দ্বকে সামাল দিয়ে বিশ্বজুড়ে শোষণকে বজায় রাখার জন্য ‘ইন্টারন্যাশনাল ট্রাস্ট অ্যান্ড কার্টেল’-এ সম্মিলিত হচ্ছে, আবার ঠিক একই সাথে আস্তিনের মধ্যে ছুরি শানিয়ে পরস্পরকে কুপোকাত করে বাজার দখলের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতেই সৃষ্টি হচ্ছে যুদ্ধ।

তিনি বলেছিলেন সাম্রাজ্যবাদ যতদিন থাকবে মনুষ্যত্ব ও সভ্যতা ধ্বংসকারী যুদ্ধ তত দিনই চলতে থাকবে। বিশ্ব আজ দেখতে পাচ্ছে তাঁর উক্ত বিশ্লেষণ কতখানি সত্য। সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার পর থেকেই সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়া চিল চিৎকার করে আসছিল দুটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার জন্যই যুদ্ধ অনিবার্য। আজ তা অন্তঃসারশূন্য বাগাড়ম্বরে পরিণত হয়েছে। কমরেড লেনিন মার্ক্সীয় বিজ্ঞানের ভিত্তিতে দেখিয়েছিলেন, যুদ্ধ হল সাম্রাজ্যবাদীদের বাজার দখলের দ্বন্দ্বের জন্য। প্রমাণ করেছিলেন কমিউনিস্টরা যুদ্ধ চায় না এবং তার বাস্তব প্রতিফলন হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়ন সমস্ত ধরনের যুদ্ধবিরোধী ও বিশ্বশান্তির পক্ষে। সেই নীতি প্রয়োগ করে পরবর্তী অধ্যায়ে তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরী কমরেড স্ট্যালিন এ কথা বিশ্ব জুড়ে প্রমাণ করেছিলেন। বিশ্বমানবতা ধন্য ধন্য করেছিল সমাজতন্ত্রের সর্বব্যাপী মহত্ত্বকে। সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থার অনুপস্থিতির পর সোচ্চারে ধ্বনিত হয়েছিল— এখন এক-মেরু বিশ্ব। এ বার একই নীতি এবং পদ্ধতিতে চলবে বিশ্ব। চলছেও তো পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী নীতিতে। কিন্তু কেন তবে এত যুদ্ধ? প্রতি মুহূর্তে এত প্রাণহানি ঘটাচ্ছে কারা? এত মানুষকে বিভিন্ন দেশ থেকে বিতাড়িত করে পথে পথে মনুষ্যেতর জীবনে ঠেলে দিচ্ছে কারা? সে কি কেবল দুর্বল রাষ্ট্রের উপর সবল রাষ্ট্রের অত্যাচার? ট্রাম্পের অতি সাম্প্রতিক ঘোষণা এ কথাই প্রমাণ করে দিল, সাম্রাজ্যবাদ কেবল দুর্বল রাষ্ট্রগুলির আর্থিক সম্পদ দলে পিষে নিংড়ে নিতে চায়, তা নয়। তথাকথিত সবল প্রতিদ্বন্দ্বীকেও কোনও প্রকারে এক ইঞ্চি জায়গা ছাড়তে সে রাজি নয়।

বাস্তবে এ ছাড়া আজ তার উপায়ও নেই। বিপুল পুঁজির ভাণ্ডার নিয়ে লগ্নির জায়গা বিশ্ব জুড়ে খুঁজে পাচ্ছে না সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি। এক মেরুর বিশ্ব আজ সাম্রাজ্যবাদী বহু মেরুতে পৌঁছেছে এবং হিংস্র রূপ ধারণ করে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গেছে। সংঘাত সেখানেই। সাম্রাজ্যবাদের শিরোমণি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরও অর্থনীতি গভীর সঙ্কটে। তার নিজের বাঁচবার উপায় নেই। অর্থনীতির চরম সংকটের বহিঃপ্রকাশ হিসাবে ওয়াল স্ট্রিটের গণবিস্ফোরণের ঘটনা আজও জ্বলজ্বল করছে। এই সংকট থেকে পরিত্রাণের গ্যারান্টি দিয়েই জনগণের দ্বারা অত্যন্ত নিন্দিত হলেও ধনকুবেরদের মদতে দ্বিতীয় বার ক্ষমতায় বসেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। কিন্তু মার্কিন ধনকুবের হাঙরদের প্রতিটি প্রত্যাশা পূরণে কি তিনি সফল হচ্ছেন? তা যে তিনি পারছেন না, তার প্রকাশ ইতিমধ্যেই ঘটেছে। দ্বিতীয়বার ট্রাম্পকে ক্ষমতায় বসানোর জন্য প্রধান সহযোগী এবং অতি নিকট বন্ধু হিসাবে কাজ করেছিলেন যিনি, সেই ইলন মাস্ক সে দেশে ইতিমধ্যেই পাল্টা রাজনৈতিক দল গঠন করে ফেলেছেন এবং এই পার্টি গঠনের সাথে সাথেই ট্রাম্পের সঙ্গে মাস্কের প্রকাশ্য দ্বন্দ্ব সামনে এসে পড়েছে।

মাস্ক তো হেলাফেলা কেউ নন, তিনি বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে বেশি সম্পদ কুক্ষিগত করে ৩২৮.৫ বিলিয়ন ডলারের মালিক। মাস্ক সরাসরি ঘোষণা করেছেন, রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাট দুটি দলের বিরুদ্ধেই লড়াই করবে তাঁর দল। ফলে বিশ্বের একচ্ছত্র অধিকর্তা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আজ দেশের অভ্যন্তরেই ক্ষতবিক্ষত অবস্থায়। এখন অবস্থা হল, এই মরণোন্মুখ পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদকে কে কত বেশি কোরামিন জুগিয়ে কতটুকু সময় বাঁচিয়ে রাখতে পারবে তার প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হতে তাই ট্রাম্পকে আগ বাড়িয়ে বিপুল পরিমাণ শুল্ক চাপানোর ঘোষণা করতে হচ্ছে। অন্যরাও পাল্টা হুমকি দিচ্ছে শুল্ক চাপানোর। বিশ্ব তা হলে প্রবেশ করল শুল্ক-যুদ্ধের পরিমণ্ডলে। মানবতার কোনও বালাই নেই, এই যুদ্ধের স্পর্ধিত ঘোষণা হল, অপর দেশের অর্থনীতিকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেব।

জীবনাবসান

উত্তর ২৪ পরগণায় দলের বারাসাত লোকাল কমিটির আবেদনকারী সদস্য কমরেড সমীর বিশ্বাস গুরুতর নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে ২৯ জুন শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর।

কমরেড সমীর বিশ্বাস ১৯৭০-এর দশকের শুরুর দিকে দমদমে দলের সঙ্গে যুক্ত হন। পরবর্তী সময়ে তিনি বারাসাতে আসেন এবং সেখানে দলের কাজ শুরু করেন।

দরিদ্র পরিবারের সন্তান হওয়ায় জীবিকা নির্বাহের জন্য অল্প বয়স থেকেই তাঁকে নানা কাজ করতে হয়। গরিব মানুষের প্রতি তাঁর ছিল গভীর মমত্ববোধ। তাঁর প্রথাগত শিক্ষা খুব বেশি ছিল না, কিন্তু তিনি কমরেড শিবদাস ঘোষের পুস্তিকা ও দলের পত্রপত্রিকা নিয়মিত চর্চা করতেন। জীবনের শেষ দিকে শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি দলের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করার চেষ্টা করতেন। সহকর্মীরা তাঁর শারীরিক অবস্থার কথা মাথায় রেখে তাঁকে বারণ করলেও তিনি অংশগ্রহণ করার জন্য জিদ ধরতেন।

সাধারণ মানুষের সাথে মেলামেশার মধ্য দিয়ে বেশ কিছু জনকে দলের প্রতি আকৃষ্ট করেছিলেন তিনি। নেতৃত্বের সংস্পর্শে এসে তাঁরা দলের কর্মীতে পরিণত হয়েছেন। আত্মীয়-স্বজনকেও তিনি দলের কাজের সঙ্গে যুক্ত করার সচেতন চেষ্টা চালিয়েছেন। শেষজীবনে তিনি দলের অফিসে থাকতেন। মরদেহ তাঁর বাসস্থান এলাকায় নিয়ে যাওয়া হলে বহু মানুষ চোখের জলে তাঁকে বিদায় দেন।

১৪ জুলাই বারাসাতে তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন জেলা কমিটির প্রবীণ সদস্য ও লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড নিত্যানন্দ ঘোষ। বক্তা ছিলেন দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড গোপাল বিশ্বাস। তাঁর সংগ্রামী জীবনের নানা দিক তিনি তুলে ধরেন। উপস্থিত ছিলেন বারাসাত-বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সম্পাদক কমরেড তুষার ঘোষ।

কমরেড সমীর বিশ্বাস লাল সেলাম

দক্ষিণ ২৪ পরগণায় কুলতলি থানার অন্তর্গত চুপড়িঝাড়া অঞ্চলে ৪নং ভুবনখালি গ্রামের দলের আবেদনকারী সদস্য কমরেড কার্তিক শিকারী ১৩ জুলাই রাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৬৪ বছর। তিনি কৃষকদের দাবি নিয়ে গড়ে ওঠা আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নিয়েছেন। তিনি পঞ্চায়েত সদস্যও নির্বাচিত হয়েছিলেন।

মৃত্যুসংবাদ পেয়ে রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড অনিরুদ্ধ হালদার, জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড গোবিন্দ হালদার ও স্থানীয় কর্মীরা তাঁর বাড়িতে যান এবং প্রয়াত কমরেডের মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

কমরেড কার্তিক শিকারীর মৃত্যুতে দল একজন বলিষ্ঠ ও দৃঢ়চেতা কর্মীকে হারাল।

কমরেড কার্তিক শিকারী লাল সেলাম

ক্যানিংয়ে শিক্ষা কনভেনশন

জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিল, যোগ্য শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের স্কুলে ফেরানো, স্কুল-কলেজে ছাত্র-নিরাপত্তা সহ নানা দাবিতে দক্ষিণ ২৪ পরগণার ক্যানিংয়ে বঙ্কুমহল ক্লাবে ১৩ জুলাই এআইডিএসও-র ডাকে শিক্ষা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড অনুমিতা পানি।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2025-27

গণদাবী GANADABI Volume: 78, No.: 1 Bengali Weekly August 1, 2025 Kolkata Price: Rs. 3.00

স্মার্ট মিটারের বিরুদ্ধে মধ্যপ্রদেশে বিশাল মিছিল

স্মার্ট মিটার বসানোর পরিণামে বিদ্যুতের চড়া বিল মেটাতে গিয়ে প্রবল সংকটে পড়ছেন মধ্যপ্রদেশের গ্রাহকরা। রাজ্য জুড়ে তাই স্মার্ট মিটারের বিরোধিতায় সরব হয়েছেন তাঁরা। মধ্যপ্রদেশ বিজলি উপভোক্তা অ্যাসোসিয়েশন-এর ডাকে স্মার্ট মিটার বসানোর প্রতিবাদে ২২ জুলাই গুনার হাজার হাজার বিদ্যুৎগ্রাহক বিক্ষোভ দেখান। গুনার শাস্ত্রী পার্ক থেকে শুরু হয়ে বিদ্যুৎগ্রাহকদের বিশাল মিছিল বিদ্যুৎ দফতরে পৌঁছায়। স্লোগান ওঠে— 'আমরা স্মার্ট মিটার চাই না'।

দফতরের সামনে বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে রাকেশ মিশ্র, নরেন্দ্র ভদৌরিয়া, লোকেশ শর্মা, মনীষ শ্রীবাস্তব প্রমুখ।

ইজরায়েলকে ভারতের সামরিক সাহায্যের তীব্র নিন্দা

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২৫ জুলাই এক বিবৃতিতে বলেন, জায়নবাদী ইজরায়েলের সঙ্গে প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত সহায়তার সম্পর্ক, যা আগে থেকেই শক্তিশালী ছিল, তা আরও জোরদার করার যে সিদ্ধান্ত বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার নিয়েছে, আমরা তার তীব্র নিন্দা করছি। বিশ্বজনমত এবং সভ্যতার সমস্ত রীতিনীতি অগ্রাহ্য করে এই ইজরায়েল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মদতে প্যালেস্টাইনে বর্বর গণহত্যা চালিয়ে যাচ্ছে। শিশু-নারী সহ নিরীহ নাগরিকদের নৃশংস হত্যাকারী এমন একটি যুদ্ধাপরাধী রাষ্ট্রের সঙ্গে ভারত সরকার যে তার দ্বিপাক্ষিক প্রতিরক্ষা সম্পর্ক জোরদার করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তা অত্যন্ত লজ্জাজনক।

সাম্রাজ্যবাদ এবং যুদ্ধ বিরোধিতার গৌরবের উজ্জ্বল ঐতিহ্যসম্পন্ন ভারতের শান্তিপ্রিয় জনসাধারণের পক্ষ থেকে আমরা দাবি করছি, জায়নবাদী ইজরায়েলের সঙ্গে করা এই প্রতিরক্ষা-চুক্তি অবিলম্বে প্রত্যাহার করে ভারত সরকার যুদ্ধবাজ সাম্রাজ্যবাদী শিবির থেকে নিজেদের সরিয়ে আনুক।

সরকারি অবহেলাতেই স্কুল বাড়ি ভেঙে ছাত্র মৃত্যু রাজস্থানে

রাজস্থানে একটি সরকারি স্কুল বাড়ি ভেঙে ৭টি শিশুর মৃত্যু ও বেশ কয়েক জনের আহত হওয়ার ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ ও শোক জ্ঞাপন করে এআইডিএসও-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবাশিস প্রহরাজ ২৭ জুলাই এক বিবৃতিতে বলেন, এই ঘটনা সরকারি শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি রাজ্যের বিজেপি পরিচালিত সরকারের অপরাধজনক অবহেলা ও তাদের অপদার্থতার কারণে ঘটেছে। সারা দেশে হাজার হাজার সরকারি স্কুলের অবস্থা শোচনীয়। মেরামতি এবং পরিকাঠামো খাতে পর্যাপ্ত অর্থবরাদ্দ না হওয়ার কারণে লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর কাছে সেগুলি মৃত্যুফাঁদে পরিণত হয়েছে।

স্কুলগুলিকে এই ধরনের দুর্ঘটনা থেকে বাঁচানোর ক্ষেত্রে নিজেদের দায়িত্ব অস্বীকার করে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার স্কুল-কর্তৃপক্ষকেই জরুরি পরিস্থিতি ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলায় তৈরি থাকার নির্দেশ দিয়েছে, যেখানে তাদের প্রথম কর্তব্য ছিল, স্কুলে যাতে এমন দুর্ঘটনা আর না ঘটে তা নিশ্চিত করা। কেন্দ্রীয় সরকারের এই আচরণ অত্যন্ত জঘন্য ও লজ্জাজনক। এর মূলে রয়েছে সরকারি স্কুলে, বিশেষ করে পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে অর্থবরাদ্দের বিপুল ঘাটতি যা আরও বাড়িয়ে তুলেছে শিক্ষার ব্যবসায়ীকরণ ও বেসরকারিকরণের লক্ষ্যে গৃহীত এনইপি ২০২০-র মতো জনবিরোধী শিক্ষানীতি।

রাজস্থানের স্কুল দুর্ঘটনার নিরপেক্ষ বিচারবিভাগীয় তদন্ত ও দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছে এআইডিএসও। তাদের দাবি, দেশের সর্বত্র ভেঙে পড়া স্কুলগুলি সারাই করতে হবে, শিক্ষা খাতে, বিশেষ করে সরকারি স্কুলের পরিকাঠামো উন্নয়নে বাড়তি বরাদ্দ, নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি প্রত্যাহার করে গণতান্ত্রিক, বিজ্ঞানভিত্তিক ও জনসাধারণের স্বার্থরক্ষাকারী শিক্ষানীতি চালু করতে হবে এবং স্কুলে ছাত্রদের নিরাপত্তার দায় সরকারকেই নিতে হবে। সরকারি শিক্ষাব্যবস্থায় এই অবহেলার প্রতিবাদে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক ও গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন নাগরিকদের কাছে আহ্বান জানানো হয়েছে।

ত্রিপুরায় কৃষকরা সঙ্কটে

স্মারকলিপি এআইকেকেএমএস-এর

ত্রিপুরায় বিজেপি সরকারের ভূমিকায় কৃষকরা এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সম্মুখীন। সরকারের প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও গত বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ফসলের সঠিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি। তাদের উৎপাদিত শাক-সব্জি ও অন্যান্য ফসল সামান্য দামে বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে অথবা জমিতে নষ্ট করে ফেলতে বাধ্য হচ্ছে। বোরো ধান কাটা হয়ে গেলেও সরকার ধান ক্রয় করছে না। এমনকী বড় বড় ধান কলের মালিকরাও ধান ক্রয় বন্ধ রেখেছে। সময় মতো সরকারি উদ্যোগে সার, বীজ ও কীটনাশক সরবরাহ করা হচ্ছে না। সেচের অভাবে চাষযোগ্য জমিতে ফসল ফলাতে পারছে না।

চাষের খরচ ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে। অথচ বাজারে কৃষকরা উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছেন না। অভাব-অনটনে বেশিরভাগ কৃষক ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ছেন। কৃষকদের সমস্ত কৃষিঋণ মকুব করার দাবির প্রতি সরকার কর্ণপাত করছে না। সমস্ত ব্যাঙ্ক থেকে সহজ শর্তে ঋণ না পেয়ে অনেক বেশি সুদে বেসরকারি সংস্থা ও সুদখোর মহাজনদের কবলে পড়ছে। এই অবস্থায় অল ইন্ডিয়া কৃষক খেতমজদুর সংগঠন ২৪ জুলাই রাজ্য সরকারের কৃষি দপ্তরে স্মারকলিপি দেয়। নেতৃত্ব দেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি বিভূলাল দে, সুব্রত চক্রবর্তী সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

কুলতলির পরিযায়ী শ্রমিকরা হেনস্থার শিকার হরিয়ানায়

সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন স্থানে পশ্চিমবঙ্গের পরিযায়ী শ্রমিকদের 'বাংলাদেশি' তকমা দিয়ে নানা ভাবে হেনস্থা করা হচ্ছে। বিশেষত বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে এই আক্রমণ চলছে। শুধু মুসলিম ধর্মাবলম্বী শ্রমিকদের উপরই নয়, হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের উপরও হেনস্থা চলছে। হরিয়ানার গুরগাঁওয়ে বাদশাপুরের গোয়াপুরে সেক্টর-৬৪তে বিগত কয়েক বছর ধরে বসবাস করছিলেন কুলতলি ব্লকের ভুবনেশ্বরী, গুড়গুড়িয়া, মৈপীঠ থেকে আগত বেশ কিছু পরিযায়ী শ্রমিক পরিবার। তাঁরা সেখানে বিভিন্ন ছোট কারখানায় কাজ করেন, গাড়ি ধোওয়া, হাউসকিপিংয়ের কাজ করেন, মেয়েরা পরিচারিকার কাজ করেন। তাঁদের প্রত্যেকের আধার কার্ড, ভোটের সচিত্র পরিচয়পত্র, প্যান কার্ড ইত্যাদি সরকারি নথি রয়েছে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও সাদা পোশাকের পুলিশ তাঁদের 'বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী' অভিযোগে তুলে নিয়ে যাচ্ছে, সাদা কাগজে বা বন্ডে সই করিয়ে নিচ্ছে, জরিমানা করছে, মোবাইল ফোন কেড়ে নিচ্ছে। অনেক সময়েই সেই পুলিশের গাড়িতে কোনও নম্বর প্লেটও থাকছে না।

এর ফলে ওই পরিযায়ী শ্রমিকেরা আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন। ২৭ জুলাই তাঁদের সঙ্গে দেখা করেন এসইউসিআই(সি) হরিয়ানা রাজ্য কমিটির এক প্রতিনিধি দল। নির্যাতিত পরিযায়ী শ্রমিকদের পক্ষ থেকে দুলাল মাইতি, তাপসী ভুঁইয়া, সরমা মাইতি, আশা ভুঁইয়া প্রমুখ তাঁদের নিরাপত্তাহীনতার কথা প্রতিনিধিদলকে জানান।

প্রতিনিধিদলের সদস্যরা এই অন্যায় আক্রমণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য হরিয়ানার মানুষের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন এসইউসিআই(সি) হরিয়ানা রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড সর্বান কুমার, কমরেড বলবন, এআইডিওয়াইও কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড দীনেশ মহন্ত এবং কমরেড রাহুল সরকার।

Editor : Amitava Chatterjee ■ Published by Amitava Chatterjee on behalf of SUCI (C), West Bengal State Committee from 48 Lenin Sarani, Kolkata 13 ■ Printed by Soumen Basu at: Ganadabi Printers and Publishers Pvt. Ltd. 52B Indian Mirror Street, Kolkata-13 ■ Phone: 9433451998, 9432889347 ■ E-mail: ganadabi@gmail.com ■ Web: https://ganadabi.com